বৈশাখের হাহাকার

ও

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

www.MurchOna.com

'বৈশাখের হাহাকার এবং অন্যান্য'

মুহম্মদ জাফর ইকবালের সাম্প্রতিক সময়ে লেখা নিবন্ধের সংকলন। পত্রপত্রিকায় প্রকাশের সময় যার খণ্ডিত রূপের সঙ্গে হয়তো পাঠকের পরিচয় ঘটেছে। লেখকের ভাষায়, 'বই হিসেবে প্রকাশ করার সময় যা বলতে চেয়েছিলাম হুবহু সেটাই' প্রকাশ করা হয়েছে। আমাদের দেশের একজন শীর্ষ জনপ্রিয় লেখক কিংবা শিশু-কিশোরদের প্রিয় বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর রচয়িতা– মুহম্মদ জাফর ইকবালের পরিচয় আজ আর কেবল এতেই সীমাবদ্ধ নয়।

সময়ের সাহসী উচ্চারণ তাঁকে ইতিমধ্যেই আমাদের কালের এক বিবেকী কণ্ঠস্বরে পরিণত করেছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর কলামধর্মী রচনার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন, সরল সত্যকে সরাসরি ও স্পষ্টভাবে বলার এক আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর করায়ত্ত। সমাজ ও সমকালের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে যে-কথাটি বলা উচিত, কাউকে না কাউকে বলতে হবে, কারো মুখ চেয়ে বা আগুপিছু ভেবে তিনি তা বলতে দ্বিধা করেন না। তা আলোচনার বিষয় তাঁর শিক্ষা বা শিক্ষাঙ্গনের বিষয় তাঁর শিক্ষা বা শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা-সঙ্কট, মৌলবাদীদের দৌরাত্ম্য, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

দলীয় বিবেচনার উর্ধ্বে থেকে মত প্রকাশের সততা ও সাহস এবং সেই সঙ্গে গভীর মানবিকতা, সংবেদনশীলতা ও দায়িত্ববোধ সমসাময়িক কলাম লেখকদের সারিতেও তাঁর রচনাগুলোকে আলাদা বৈশিষ্ট্য বা অনন্যতা দিয়েছে। এই বইটিতে পাঠক বিশেষভাবেই যার পরিচয় পাবেন।

এই বছরে বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত লেখাগুলো সংকলিত করে 'বৈশাখের হাহাকার এবং অন্যান্য' প্রকাশিত হল। এতোদিন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করতে গিয়ে যে বিষয়টা আমি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছি সেটা হচ্ছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা—আমি যেটা বলতে চেয়েছি সব সময়েই সেটা বলে এসেছি। সে হিসেবে এই বছরটা খুব বড় ব্যতিক্রম, এই প্রথমবার আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা সবসময় বলতে পারি নি। পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্যে আমার লেখার উপর কাঁচি চালাতে হয়েছে, কাট ছাট করতে হয়েছে, স্পর্শকাতর নাম উহ্য রাখতে হয়েছে, মন্তব্য সংবরণ করতে হয়েছে। বই হিসেবে প্রকাশ করার সময় যা বলতে চেয়েছিলাম হুবহু সেটাই প্রকাশ করা হলো—সংবাদপত্রের পাঠক না জানলেও বইয়ের পাঠকেরা অন্তত জানুক আমি আসলে কী বলতে চেয়েছিলাম!

ছাপার আগে লেখাগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে আবিষ্কার করলাম বছরটি শুরু করেছিলাম অনেক আশা নিয়ে বছরটি শেষ করেছি আশাভঙ্গের বেদনা দিয়ে। শুধু তাই নয়, সারাটি বছর কেটে গেছে একধরনের অস্থিরতার ভেতর দিয়ে, একধরনের ক্ষোভের ভেতর দিয়ে। যা বলতে চাই সেটা বলতে পারব না বলে লেখালেখি হয়েছে অনেক কম! পাঠক নিশ্চয় সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
১৭.১১.২০০৭

সূচি

গোড়া থেকে শুরু ১১

একটু লেখা পড়া নিয়ে কথা বলি? ১৮

তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং আমরা ২৫

উচ্চ শিক্ষায় বাংলা পাঠ্যবই ৩২

মার্চের ভালবাসা ৪০

সুস্থ পৃথিবী অসুস্থ মানুষ ৪৭

বৈশাখের হাহাকার ৪৯

স্বপ্ন কী বিক্রি করা যায়? ৫৭

একটি লঙ্গরখানার কাহিনী ৬৩

ভাই, দেশটা কোন দিকে যাচ্ছে? ৬৯

প্রতিপক্ষ যখন ছাত্র শিক্ষক ৭৬

ভাঙ্গা রেকর্ডটা আরেকবার বাজাই? ৮৩

ঘৃণা থেকে মুক্তি চাই? ৯০

ছাত্র শিক্ষক : এখন দুঃসময় ৯৭

ফিরে দেখা ৯৯

গোড়া থেকে শুরু

এরিখ মারিয়া রেমার্কের উপন্যাসের একটা চরিত্র তার জীবনে মধুর কিছু ঘটলেই নতুন একটা গানের রেকর্ড কিনে এনে সেটা শুনত। মধুর একটা ঘটনার সঙ্গে প্রথমবার শোনা সেই গানটি এমনভাবে স্মৃতিতে মিশে যেত যে পরে সে যতবার সেই গানটি শুনত ততবার তার বুকের ভেতর সেই মধুর অনুভূতিটি অনুভব করত। আমার কাছে আইডিয়াটা খুব মজার মনে হয়েছিল, ভেবেছিলাম আমিও এটা করব। সেটা করা হয়নি কারণ সত্যিকার জীবনে মধুর ঘটনা খুব ঘন ঘন ঘটে না, যদিবা ঘটে তখন গানের সিডি কেনার কথা মনে পড়ে না, কোনোভাবে কেনা হলেও সেটা শোনার জন্য কোথাও সিডি প্লেয়ার খুঁজে পাই না।

তবে তার ঠিক উল্টোটা ঘটতে শুরু করেছে, সাইকোলজিতে তার একটা গালভরা নামও আছে, বিতৃষ্ণা থেরাপি (aversion therapy)। যে মানুষ সিগারেট খায় তাকে যদি প্রত্যেকবার সিগারেট ধরানোর সঙ্গে সঙ্গে একটা ইলেকট্রিক শক দেওয়া যায় তা হলে কিছুদিনের মধ্যে তার ভেতরে একটা পাকাপাকি পরিবর্তন হয়ে যাবে, সে আর সিগারেট ধরাতে পারবে না। সিগারেট ধরানোর কথা চিন্তা করলেই ইলেকট্রিক শক খাওয়ার একটা অজানা আতঙ্কে তার শরীর সিঁটিয়ে যাবে। আমাদের খুব দুর্ভাগ্য যে এখন পুরো জাতিকে এরকম একটা বিতৃষ্ণা থেরাপির ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। দুর্ভাগ্যটা খুব মর্মান্তিক কারণ এই থেরাপির জন্য যে শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা খুব পবিত্র একটা শব্দ, শব্দটা হচ্ছে 'সংবিধান'। আমার ধারণা দেশে এখন যা হচ্ছে সেটা যদি আরও কিছুদিন হতে থাকে তাহলে সংবিধান শব্দটি শুনলেই মানুষ আঁতকে উঠবে, বুকে হাত দিয়ে মানুষ ভাববে সংবিধান রক্ষা করার জন্য এখন না জানি তাদের ওপর কোন গজব নেমে আসছে।

ব্যাপারটা বোঝার জন্য আমাদের খুব সহজ একটা প্রশ্ন করতে হবে, "প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন কি নিরপেক্ষ?" উত্তর হচ্ছে, "না"! আমি নিশ্চিত

প্রফেসর ইয়াজউদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করলেও তিনি বলবেন, "মাথা খারাপ! আমি যদি নিরপেক্ষ হতাম তাহলে কি আমাকে ম্যাডাম প্রেসিডেন্ট বানাতেন?" (প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে শুনেছি তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে এখনো ম্যাডাম বলে ডাকেন।) প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন নিরপেক্ষ নন, তাই যেদিন তাঁকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের দায়িত্বটি দেওয়া হয়েছিল ঠিক তখনই সংবিধানটি লঙ্ঘন করা হয়েছে। (মনে আছে সেই রাতে ১৪ দল বিষয়টি মেনে নিয়েছিল বলে দেশের মানুষ কত বড় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল?) যাঁরা সেই রাতে অসুস্থ, দুর্বল এবং দলীয় মানুষটিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বানানোর জন্য সংবিধান লঙ্ঘন করতে একটুও দ্বিধা করেননি, এখন তাঁরাই সংবিধান রক্ষা করার জন্য যেভাবেই হোক ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করে ফেলবেন—শুনলে পুরো বিষয়টাকে কেমন যেন তামাশার মতো মনে হয়। আমরা সাধারণ মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তামাশা করতে ভয় পাই, গুরুত্বপূর্ণ মানুষের কাছে এই দেশ আর দেশের মানুষ এত তুচ্ছ যে তাদের জীবনকে নিয়ে তামাশা করতে তাদের চোখের পাতাও কাঁপে না। এখন আমরা খবরের কাগজ খুললেই দেখি "সংবিধান! সংবিধান!!" টেলিভিশন খুললেই শুনি, "সংবিধান লঙ্ঘন! সংবিধান রক্ষা!!" আর আমাদের দিন কাটে টেলিভিশনে পুলিশ-মানুষ মারামারি দেখে, আমরা সবাই ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করে আছি আরও বড় মারামারি দেখার জন্য। আগের দিনে আমরা অনুমান করতে পারি না পরের দিনটা কেমন হবে, মাঝেমধ্যে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকি। সংবিধান শব্দটি হয়ে যাচ্ছে বিতৃষ্ণা থেরাপির মতো, এটি আমাদের সব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে না, এই শব্দটি ব্যবহার করে আমাদের ঠেলে দেওয়া হয় আরও বড় বিপদের মধ্যে।

পুরো বিষয়টার মধ্যে আরও কিছু বিচিত্র ব্যাপার আছে। ধরা যাক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কোনো কিছু ঠিকভাবে করলেন না—যেমন নিরপেক্ষ একজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ না দিয়ে এমন একজনকে নিয়োগ দিলেন যিনি নিরপেক্ষ নন। শুধু যে নিরপেক্ষ নন তাই নয়, তিনি একাত্তরের পাকিস্তান মিলিটারির সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, পরাজিত হয়ে সারেন্ডার করে ধরা পড়েছেন। এরকম একটা অবিশ্বাস্য নিয়োগের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ করতে হয় তাহলে সেই অভিযোগটি কার কাছে করা হবে? দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে। আর দেশের রাষ্ট্রপতি কে? আমাদের সেই প্রফেসর ইয়াজউদ্দিন! যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চাই তাঁর কাছেই যদি অভিযোগ করতে হয় তাহলে সেটা কি একটা উৎকট রসিকতা নয়?

কেউ যদি হতাশার চরমে পৌঁছে পুরো ব্যাপারটাকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করতে চায় তাহলে কী হবে? আমরা সেটাও দেখেছি—ঠিক রায় দেওয়ার আগ মুহূর্তে বিচারকদের চেষ্টাকেই ভেঙে দেওয়া হবে। বাংলাদেশে সবই সম্ভব। কাজেই এরকম একটা অবস্থায় কেউ যদি মনে করে আসলে সংলাপ করে কিছু হবে না, লেখালেখি করে কিছু হবে না, কোর্টে গিয়েও কিছু হবে না, ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করতে হবে রাস্তাঘাটে আন্দোলন করে, তাহলে কে কাকে দোষ দেবে? আমরা কি সেটাই দেখছি না? এবার আমাদের সব হিসাব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো দলের সরকার নয়। তাই কেউ যদি আন্দোলন করতে চায় করবে, রাস্তাঘাটে মিটিং-মিছিল করবে, বক্তৃতা দেবে, গণসঙ্গীত গাইবে, পুলিশ, বিডিআর, মিলিটারি দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু সেটাও সত্যি হয়নি, প্রথমেই গণগ্রেপ্তার। কত গরিব মানুষকে পুলিশ ধরে এনেছে! গেটে দাঁড়িয়ে আছে মা, স্ত্রী আর আপনজন। রাস্তায় মিছিল নামতেই পুলিশ এসেছে বেধড়ক পিটুনি দিতে, আর সে কী পিটুনি! নারী-পুরুষ নেই, ছোট-বড় নেই, একজন মানুষকে দেখলাম উলঙ্গ অবস্থায় মার খেতে খেতে ছুটে যাচ্ছে। এর চেয়ে করুণ দৃশ্য আর কী হতে পারে? এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আরও একটি নতুন বিষয় দেখেছি, একজনের হাত থেকে জাতীয় পতাকা ছিনিয়ে নিয়ে একজন পুলিশ সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ময়লা-আবর্জনার মধ্যে। জাতীয় পতাকা কিন্তু এক টুকরো কাপড় নয়, এই পতাকাটির জন্য এই দেশের লাখ লাখ মানুষ প্রাণ দিয়েছে। মাঝখানের লাল বৃত্তটি কিন্তু মানুষের রক্ত দিয়ে আঁকা। যে পুলিশ সেটা জানে না, সে কোন দেশের মানুষ? পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তাদের পুলিশ বাহিনীকে কি সেটা শিখিয়েছে? জাতীয় পতাকা ছুঁড়ে দেওয়ার সেই দৃশ্যটি কি পুলিশ কর্মকর্তারা দেখেছেন? জাতীয় পতাকার অবমাননা করার জন্য টেলিভিশনের ফাইল ছবিটা দেখে তাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা কি আছে পুলিশ বাহিনীর?

২

আমি একেবার একটি রোলার কোস্টারে উঠেছিলাম, আমাদের দেশে বিনোদনের এই বিষয়টি আছে কি না জানা নেই। নানা রকম রোলার কোস্টার আছে, আমি যেটাতে উঠেছিলাম সেটা ধাতব রেলের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে গিয়ে শূন্যে সাতবার পাক খেয়ে শেষ পর্যন্ত নিচে ফিরে আসে। এ ধরনের উত্তেজনার জন্য আমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই বরং

ভয়াবহ আতঙ্ক আছে, তবুও আমি আমার কম বয়সী ছেলের আবদারে তার সঙ্গে সেখানে উঠেছিলাম। আমার মনে আছে রোলার কোস্টার ছুটে যাওয়ার সময় কিংবা শূন্যে পাক খাওয়ার সময় আমরা আমরা যেন ছিটকে পড়ে না যাই সেই বিষয়টা নিশ্চিত করে দায়িত্বে থাকা মানুষটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "উপভোগ করো" তারপর একটা সুইচ টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছোট খাঁচার মতো গাড়িটি আমাকে নিয়ে ঘুরঘুর করে ওপরে উঠতে শুরু করল। আমি তখন নিজের ভেতর এক ধরনের বিচিত্র আতঙ্ক এবং অসহায়ত্ব অনুভব করেছিলাম। আমি জানি কিছুক্ষণের ভেতরেই আমাকে নিয়ে এই ছোট খাঁচাটি ওপরে-নিচে-ডানে-বাঁয়ে ছুটে যাবে, শূন্যে পাক খাবে এবং শেষ পর্যন্ত অর্ধমৃত অবস্থায় নিচে নামিয়ে দেবে—আমি এখন আর কোনোভাবেই এখান থেকে ফিরে যেতে পারব না, সামনের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আমাকে যেতেই হবে।

বহুদিন পর আবার আমার সেই ঘটনার কথা মনে পড়ছে। জামায়াত-বিএনপি ছাড়া সব দল ২২ জানুয়ারির নির্বাচন বয়কট করেছে, তারপরেও এই দিনে নির্বাচন করার সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সরকার এবং চারদলীয় জোট বলছে, যেভাবেই হোক নির্বাচন হবে, বাকি সব রাজনৈতিক দলের মহাজোট বলছে যেভাবেই হোক নির্বাচনকে ঠেকাতে হবে। আগামী দিনগুলোর জন্য হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও ঘোষণা করা হয়েছে। আমার জানামতে এ ধরনের একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলাদেশের মানুষ বহুকাল দেখেনি। আমরা সবাই জানি এটি আসছে এবং আমাদের সবাইকে এর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হচ্ছে বাংলাদেশের সব মানুষকে একটা রোলার কোস্টারে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু বোঝার আগেই সেই রোলার কোস্টার ভয়াবহ বেগে ছুটে যাবে, এখান থেকে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

অথচ এ রকমটি হওয়ার কথা ছিল না। সবাই মিলে উৎসবের মতো একটি নির্বাচন করার কথা ছিল। কিছুদিন আগে একটি নাগরিক কমিটি করা হয়েছিল, তাঁদের একজন সদস্য হিসেবে আমি বেশ কয়েক জায়গায় গিয়েছি। সেখানে দেশের মানুষ এই দেশ নিয়ে, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে, নির্বাচন নিয়ে কী ভাবেন সেটা শোনার সুযোগ পেয়েছি। দেশের জন্য তাঁদের কী মমতা, কী ভালোবাসা! সেটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য কত রকম পরিকল্পনা, কত রকম স্বপ্ন! নির্বাচন নিয়েই তাঁরা কত রকম প্রস্তাব দিয়েছেন, কিন্তু এখন সবকিছু অর্থহীন। একটি নির্বাচনের দিন ঠিক করা

হয়েছে, কিন্তু এ রকম নির্বাচন তো কেউ চায়নি, চারদলীয় জোটও বলেছে তারাও চাইছে না। কেউই যদি না চায় তারপরেও কেন আমাদের এ রকম একটা নির্বাচনের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, এই শিশুসুলভ প্রশ্নের উত্তর কোনো বড় মানুষ দিতে পারবে?

আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পুরো বিষয়টা ঘটছে একজন মানুষকে ঘিরে, তিনি হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটা নির্বাচন দিয়ে যিনি তাঁর নাম ইতিহাসে লিখে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি সেই সুযোগটি নিলেন না। তিনি দুর্বল, অযোগ্য, দলের তল্পিবাহক হয়ে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে ঝাঁপ দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

৩

গত পাঁচটি বছর আমার খুব কষ্টে কেটেছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভাগীয় প্রধান, ডিন ইত্যাদি ইত্যাদি—আমার ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব। আমি গত পাঁচ বছর দেখছি সেই দায়িত্বগুলো ঠিকই আছে কিন্তু দায়িত্ব পালন করার জন্যে আমি একটা সুতাও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরাতে পারি না। সাধারণ মানুষ শুনলে বিশ্বাস করবে না, কী অবর্ণনীয় যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে আমাদের দিন কাটাতে হয়েছে। চোখের সামনে দেখেছি একটি একটি করে প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়েছে। যাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার কথা নয় তাঁরা শিক্ষক হয়ে শার্টের হাতা গুটিয়ে ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়ান। সহকর্মীদের পীড়ন করেন, ছাত্রদের পেটান—একটা ভয়াবহ অবস্থা। আমি যে রকম যন্ত্রণা সহ্য করেছি, দেশের অনেক মানুষও নিশ্চয়ই সে রকম যন্ত্রণা সহ্য করেছে। চেয়েছে বিদ্যুৎ পেয়েছে খাম্বা, আশি টাকায় কাঁচা মরিচ কিনেছে, তুচ্ছ মানুষের চোখের সামনে দুর্নীতি করে আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে দেখেছে, জেএমবির বোমা দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠেছে। তারা সবাই নিশ্চয়ই একটা পরিবর্তন চাইবে। দেশের সব মানুষ একটা নির্বাচনের ভেতর দিয়ে সেই পরিবর্তনটুকু করে দেবে, আমরা সবাই সে জন্য অপেক্ষা করে ছিলাম, শুধু একটা পরিবর্তনের সুযোগ, তার বেশি কিছু চাইনি। আমরা সেই সুযোগটি পেলাম না, তার বদলে পেয়েছি দীর্ঘ একটা অনিশ্চিত সময়।

নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডে আমরা যে খুব আশাবাদী ছিলাম তাও নয়। এরশাদের আমলে আমি দেশে ছিলাম না, তাঁর স্বৈরাচারী ভূমিকাটি আমার নিজের চোখে দেখা হয়নি। যাঁরা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে

দেশে গণতন্ত্র এনেছিলেন এখন তাঁদের আশাহত শুকনো মুখ দেখে এক ধরনের দুঃখবোধ হয়। বিএনপি শাসন আমলে যে সাংসদ তাঁর অত্যাচার-নিপীড়নে সবার বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি হঠাৎ করে এলডিপিতে যোগ দিয়ে আবার মহাজোটের পক্ষে বিএনপির বিরুদ্ধে নির্বাচন করতে নেমে গেছেন, সেটাও সাধারণ মানুষ কেমন করে মেনে নেয়? আওয়ামী লীগের অনেক ক্রটির পরেও তাদের একটা সেক্যুলার আদর্শ ছিল, হঠাৎ করে খেলাফত মজলিসের সঙ্গে চুক্তি করে সেই আদর্শটাকে বাক্সবন্দী করে ফেলেছে! ভোটের হিসেবে সেটা তাঁদের কত বড় লাভ তাঁরাই জানেন, আমাদের জন্যে সেটা অনেক বড় হতাশা।

চারপাশে এ রকম নানা ধরনের হতাশা আর মন খারাপ করা ঘটনা। এর মধ্যে আমাকে এক মুহূর্তের জন্যে আশার আলো দেখিয়েছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চার জন উপদেষ্টা। তাঁরা একটা দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই দায়িত্ব পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, যখন দেখতে পেয়েছেন দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না, নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকার জন্যে দায়িত্বটি ছেড়ে চলে এসেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টার পদটিতে নিশ্চয়ই এক ধরনের মাদকতা আছে, সামনে পেছনে পুলিশের গাড়ি, হুইসেল দিয়ে সবাইকে সরিয়ে তাঁদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের ঘিরে থাকে টেলিভিশনের ক্যামেরা, মুখ খুলে কিছু বললেই সেটা প্রতিটি চ্যানেলে দশবার করে দেখানো হয়। শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে না পারলেও কোনো সমস্যা নেই, আঞ্চলিক উচ্চারণ অশুদ্ধ বাংলাতেই সেটা সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় সম্মান, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, রাষ্ট্রীয় প্রতাপ—নিঃসন্দেহে তার এক ধরনের আকর্ষণ আছে। দশজন উপদেষ্টার মধ্যে চারজন উপদেষ্টা সেই প্রবল আকর্ষণকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন। ফিরে গেছেন তাঁদের একান্ত সাদামাটা জীবনে। বিষয়টা আমাকে এক ধরনের অনুপ্রেরণা দিয়েছে, আমার বিশ্বাসকে শক্তি দিয়েছে। আমি জানি আমাদের দেশের সব জায়গায় এ রকম মানুষ আছেন, যাঁদের অর্থ-বিত্ত, সম্মান-প্রতিপত্তি দিয়ে কেনা যায় না। আমি জানি আমাদের এই দুঃখী দেশটার জন্য তাঁদের ভেতরে গভীর মমতা রয়েছে। দেশ যখন খুব বড় একটা বিপদে পড়বে আমি জানি দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ রকম মানুষগুলো এক সঙ্গে হবে এই দেশকে রক্ষা করার জন্য। শুধু রাজনৈতিক নেতাদের গালি দিলে হবে না, শুধু হতাশায় মাথা চাপড়ালে হবে না, আমাদের পরের প্রজন্মের জন্য

সুন্দর একটা বাংলাদেশ আমাদেরই রেখে যেতে হবে। যদি একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হয় তাহলে সেটাই করতে হবে।

৪

বেশ কিছুদিন আগে বাংলাদেশের বড় একটা প্রতিষ্ঠান আমাদের কয়েকজনকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান দেখিয়েছিল। সত্যি সত্যি আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত, সেটি একবারও মনে হয়নি কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের ভালোবাসা এবং মমতাটুকুর প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য আমি সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। সেই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ অন্যান্যের সঙ্গে আমার গলায় একটা সোনার মেডেল পরিয়ে দিয়েছিলেন। যে মানুষটি একা একটা দেশকে এ রকম ভয়াবহ দুর্যোগের মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন, তাঁর হাত থেকে আমি একটা সোনার মেডেল নিয়েছি—চিন্তা করে কদিন থেকে আমি সঙ্কুচিত হয়ে আছি। আমার কাছে সেই মেডেলটাকে বাঁচিয়ে রাখার মতো একটা জিনিস মনে হচ্ছে না বরং একটা অশুচি জিনিস বলে মনে হচ্ছে।

অশুচি একটা জিনিস ঘরে রাখতে মনে চাইছে না, আমি তাই সেটা দান করে দিয়েছি। সব অশুচি জিনিসকেই যদি এত সহজে দূর করে দেওয়া যেত তাহলে কী মজাই না হতো!

১০.০১.২০০৭ (অপ্রকাশিত)

একটু লেখাপড়া নিয়ে কথা বলি?

আমরা খবরের কাগজ পড়তে খুব পছন্দ করি! আমাদের খবরের কাগজ মোটামুটি স্বাধীন (মোবাইল টেলিফোনের বদনাম করা যাবে না এবং নিরপেক্ষ দেখানোর জন্য এক দলকে গালাগাল করতে হলে তার সঙ্গে অন্য দলকেও একটু গালাগাল করতে হবে— এই দুটো জিনিস অবশ্যি মেনে নিতে হবে!)। কাজেই জরুরি অবস্থা ঘোষণার সময় যখন হঠাৎ করে মনে হলো পত্রপত্রিকার ওপর হস্তক্ষেপ করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তখন আমাদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। আমরা আবার যখন বুঝতে পেরেছি যে আসলে পত্রপত্রিকায় আগের মতোই লেখালেখি করা যাবে তখন আমাদের জানে পানি এসেছে। আমরা যা ইচ্ছে তা-ই লিখতে পারব কথাটা সত্যি; কিন্তু মজার ব্যাপার, পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে শুধু দেশের রাজনীতির কথা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম ধাক্কাটা যাওয়ার পর আমরা একটা সংঘাতের মুখোমুখি হলাম, যখন গভীর হতাশায় প্রায় ডুবে যাচ্ছি তখন হঠাৎ করে জরুরি অবস্থা! আমাদের রাষ্ট্রপতি একেবারে অ্যাবাউট টার্ন করে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন এ দেশের মানুষ সেটা দীর্ঘদিন মনে রাখবে। সংবিধান সমুন্নত রাখার জন্য নাকি অনেক কিছু করা যাচ্ছিল না, এখন ম্যাজিকের মতো সেসব করা হয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনের তারিখ পিছিয়েছে, নির্বাচন কমিশন নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে, গডফাদার এবং গড-গ্র্যান্ড ফাদাররা নানা গর্তে লুকিয়ে পড়ছেন, মাঝেমধ্যে নিজেকে চিমটি কেটে দেখতে হয় আসলেই কি এটা ঘটছে নাকি স্বপ্ন দেখছি! পত্রপত্রিকায় এত মজার মজার খবর, এত চমৎকার সব কলাম, আলোচনা এবং বিশ্লেষণ— সবই দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ওপর। অন্য কিছু নিয়ে কেউ কিছু লিখলে পাঠকেরা বিরক্ত হয়ে ওঠেন— তার পরও আমি সাহস করে একটু অন্য বিষয় নিয়ে লিখতে চাই। নির্বাচন নিয়ে নয়, ভোটার আইডি নিয়ে নয়, গডফাদারদের নিয়ে নয়; লেখাপড়া নিয়ে!

একটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক অবস্থাকে পাস কাটিয়ে এই নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসেছে বলে সাধারণ মানুষ খুব খুশি। জরুরি অবস্থা থাকার জন্য

চোর-ডাকাতদের ধাওয়া করা হচ্ছে সেটা নিয়েও সবার ভেতরই এক ধরনের স্বস্তি। এর মধ্যে আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কয়েক দিন আগে জাতির উদ্দেশ্যে একটা চমৎকার ভাষণ দিয়েছেন। আমরা যা যা চাই তার সবকিছুই এখানে আছে শুধু একটা জিনিস ছাড়া, সেটা হচ্ছে লেখাপড়া। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সেই ভাষণে একটি কথাও নেই, তার দুটি অর্থ হতে পারে, এক. দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এত চমৎকারভাবে চলছে যে এই তত্ত্বাবধায়ক আমলে এটা নিয়ে কিছু করার প্রয়োজন নেই। দুই. আমাদের এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার অন্য বিষয়গুলোকে যতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, লেখাপড়ার বিষয়কে ততটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। কোনটা সত্যি আমি জানি না, কিন্তু যেটাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভেবে থাকুক কোনোটাই কিন্তু আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। প্রথমত, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটা মহা বিপর্যয় ঘটে আছে এবং দ্বিতীয়ত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেখানে বিশাল অবদান রাখতে পারে। আমার মনে হয়, একটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এলে তারা যেসব কাজ করতে পারবে না এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার তার কিছু কাজ করে রাখতে পারবে।

২

দেশের স্কুলে একটা ভয়াবহ ব্যাপার ঘটছে— এর নাম হচ্ছে এসবিএ (School Based Assessment) বা বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন। বিগত সরকারের আমলে দেশের মানুষের পাঁচ শ কোটি টাকা লুটপাট করে একমুখী শিক্ষা নামে একটা সর্বনাশ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। অনেক কষ্ট করে সেটা বন্ধ করা হয়েছিল। সেই ষড়যন্ত্রেরই একটা অংশ হচ্ছে এসবিএ, যেখানে স্কুলের শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ত্রিশ ভাগ মার্কস দেবেন, বাকি শতকরা সত্তুর ভাগ মার্কস আসবে তাদের পরীক্ষা থেকে। একজন শিক্ষকের হাতে যখন ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ত্রিশ ভাগ মার্কস দেওয়ার ক্ষমতা চলে আসে তখন তিনি আর শিক্ষক থাকেন না, তিনি ঈশ্বরের কাছাকাছি একটা জায়গায় চলে যান। একমুখী শিক্ষা ঠেকানোর আন্দোলনের সময় বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল, আমরা তখন বলেছিলাম যে এই মার্কসগুলো বেচাকেনা হবে এবং আমাদের কথা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে, সত্যি সত্যি সেটা ঘটতে শুরু করেছে। অভিভাবকেরা আমরা কাছে ফোন করে কাতর গলায় বলেছেন এই ত্রিশ মার্কসের জন্য শিক্ষকেরা তাঁদের কাছে টাকা চাইছেন, সেই টাকা দেওয়ার

ক্ষমতা নেই, তাঁদের ছেলেমেয়ের পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এই এসবিএ দিয়ে যে সমস্যাগুলো হবে এটা হচ্ছে তার সবচেয়ে সহজ সমস্যা। জটিল সমস্যাগুলো হবে অন্যভাবে, যখন একজন স্থানীয় মাস্তান একজন শিক্ষককে দেয়ালে চেপে ধরে তাঁর গলায় চাকু বসিয়ে বলবে, "আমার ছেলেকে যদি ত্রিশ-এ ত্রিশ না দিস তাহলে তোর লাশ পড়ে যাবে!" কিংবা আরও হৃদয়হীন ব্যাপার ঘটবে যখন একজন মন্ত্রী, সাংসদ কিংবা আমলা একজন শিক্ষককে ফোন করে বলবে, "আমার মেয়েকে যদি ত্রিশ-এ ত্রিশ না দাও তাহলে কাল সকালে তোমাকে সুন্দরবনে বদলি করে দেব!"

যাঁরা এ বিষয়গুলো হুট করে চাপিয়ে দেন তাঁদের আসলে বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই এবং এই দেশের লেখাপড়া কীভাবে হয় সে সম্পর্কেও বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। একজন শিক্ষক যদি গোটা ত্রিশেক ছাত্রছাত্রী পড়াতেন তাহলে তিনি সেই ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে জানতে পারতেন, তার একটা মূল্যায়ন করতে পারতেন। একজন শিক্ষকের যখন একটা ক্লাসে এক-দেড় শ ছাত্রছাত্রী সামলাতে হয় তাঁরা তখন সবাইকে চেনেন পর্যন্ত না, কীভাবে তারা এত বড় মূল্যায়ন করবেন? কেমন করে এই নিয়মটি এখন এই দেশে চালু হতে যাচ্ছে? শিক্ষকদের হাত থেকে ত্রিশ মার্কস কোনোভাবে ম্যানেজ করতে পারলে পাস করার জন্য দরকার আর মাত্র তিন মার্কস! প্রশ্নপত্রে চোখ বন্ধ করে গোল্লা ভরাট করলেই তো এই তিন মার্কস চলে আসবে—তার অর্থ এই নতুন নিয়মে একজন ছেলে বা মেয়ে একটা অক্ষর পর্যন্ত না জেনেও পাস করে যেতে পারবে। দেশের লেখাপড়ার এত বড় সর্বনাশ কারা করে?

যখন একমুখী শিক্ষা থামানোর চেষ্টা করা হয়েছিল তখন এই এসবিএ-কেও থামানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। যাঁরা ষড়যন্ত্র করেন তাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ষড়যন্ত্র করে যান, তাই একমুখী শিক্ষা বন্ধের ঘোষণা দিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেন। একেবারে ষড়যন্ত্রের কায়দায় এ দেশের ছেলেমেয়েদের ওপর এসবিএ নামের এই অবিচারটি গোপনে চাপিয়ে দিলেন। দেশের জন্য তাঁদের কি একটুও মায়া নেই?

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা বিষয়টি বিবেচনা করে দেখুন। যদি মনে হয় সত্যিই এই বিষয়টা আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার উপযোগী নয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে যেন সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমি আমার পক্ষ থেকে তাদের নিশ্চয়তা দিতে পারি, এত কম পরিশ্রমে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার এত বড় উপকার করার সুযোগ তাঁরা আর কখনো পাবেন না।

৩

কিছুদিন আগে এই দেশে আরও একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে গেছে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য খুব ব্যস্ত। মেডিকেলের পরীক্ষা নেওয়া হল কেন্দ্রীয়ভাবে এবং এই বছর ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে ছেলেমেয়েরা, মেডিকেলের ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করেছে, সেই সময়কার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা ছিলেন তাঁকেও সেটা জানানো হয়েছিল। হাইকোর্ট থেকে রিট হয়েছিল, কিছুদিনের জন্য ভর্তি বন্ধ করা হয়েছিল। দেশে ঠিক তখন প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা। শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে জানার জন্য যখন খোঁজ নিয়েছি তখন জানতে পেরেছি ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দেওয়া ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়ে গেছে, সম্ভবত তাদের ক্লাসও শুরু হয়ে গেছে। এর ভেতরে সত্যিকারের খাঁটি ছাত্রছাত্রীরা আছে, যারা ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র দেখেনি, নিজের মেধা দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, এর মধ্যে অনেক ছেলেমেয়ে আছে, যারা ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র দেখে পরীক্ষা দিয়েছে। তারা মেডিকেলে পড়ার যোগ্য কি না সেটা আমরা জানি না। শুধু এটুকু জানি, তারা তাদের জীবনটা শুরু করেছে একটা ভয়ঙ্কর দুর্নীতি দিয়ে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে একটু খোঁজ নিয়েছি, এর মধ্যে অনেক রাঘব বোয়াল জড়িত। মেডিকেল কোচিং নামে কিছু ভয়ঙ্কর প্রতিষ্ঠান আছে, যাঁরা এটা পরিচালনা করেন তাঁরা ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে নিয়ে আসেন। দুই থেকে তিন লাখ টাকা দিলে সেই প্রশ্ন পড়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদের সারা রাত সেই প্রশ্ন এবং তার উত্তর মুখস্থ করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা যখন ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র মুখস্থ করছে তখন তাঁদের বাবা-মায়েরা যেন বিশ্রাম নিতে পারেন সে জন্য ফ্ল্যাট ভাড়া করা হয়েছে। তাঁদের খাওয়ার জন্য ডিনারের প্যাকেট আনা হয়েছে। বাবা-মায়েরা একটা ফ্ল্যাটে বসে অপেক্ষা করছেন যখন তাঁদের কম বয়সী সন্তানেরা এই দেশের সবচেয়ে জঘন্য একটা দুর্নীতিতে অংশ নিচ্ছে—এটা কি গ্রহণ করা সম্ভব?

নতুন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসেছে তাদের কাছে আমি হাত জোড় করে অনুরোধ করছি, এই ভয়ঙ্কর দুর্নীতির রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে। জোট সরকারের আমলে গিয়াসউদ্দিন মামুন প্রবল প্রতাপশালী একজন

মানুষ ছিলেন। গাজীপুরের আহসানউল্লাহ মাস্টারকে হত্যা করার পর যে ক্ষুব্ধ লোকজন এই গিয়াসউদ্দিন মামুনের বাগানবাড়ি 'খোয়াব' ভাঙচুর করেছিল সঙ্গে সঙ্গে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। খবরের কাগজে দেখছি এই প্রবল প্রতাপশালী মানুষটি এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, পুলিশ-র‍্যাব-মিলিটারি তাকে খুঁজছে।

কাজেই যে প্রবল প্রতাপশালী মানুষেরা মেডিকেলের প্রশ্নপত্র ফাঁস করে কয়েক শ ছাত্রছাত্রীর কাছে কয়েক লাখ টাকায় বিক্রি করে রাতারাতি কয়েক কোটি টাকা কামাই করেছিল এখন তাদের সেই প্রতাপ নাও থাকতে পারে! আমরা এই মানুষগুলোর পরিচয় জানতে চাই, তাদের গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নিয়ে যাওয়া হোক, কোন কোন ছাত্রছাত্রীর বাবা-মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রশ্নপত্র বিক্রি করেছে সেই তথ্য বের করে নিয়ে আসা হোক। সেসব ছাত্রছাত্রীর মেডিকেল কলেজের ভর্তি বাতিল করা হোক।

কেন বিষয়টি তদন্ত করে বের করা সম্ভব হয়নি আমরা জানি না। এটি খুব সহজেই তদন্ত করে বের করা সম্ভব। যদি তদন্ত করে বের করে এই ভয়ঙ্কর রকম লোভী মানুষগুলোকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে দেশের একটা বড় উপকার হবে। ভবিষ্যতে এই কাজটুকু করার সাহস কেউ পাবে না। আমি একই সঙ্গে জানতে চাই, যাঁরা এই ভর্তির প্রশ্নপত্র তৈরি করার দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা কী করেছেন? কেন প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছিল?

সিন্ডিকেট করে টাকা চুরি করা বা মুখে এসিড মারার চেয়েও অনেক বড় অপরাধ আমাদের দেশের লেখাপড়ার সর্বনাশ করে দেওয়া। এই দুর্বৃত্তরা শুধু যে লেখাপড়ার সর্বনাশ করছে তা-ই নয়, তারা এ দেশের নতুন প্রজন্মকে কেমন করে দুর্বৃত্ত হতে হয় সেই বিষয়টা শিখিয়ে দিচ্ছে। এই দুর্বৃত্তদের সমাজ থেকে সরিয়ে না দিলে আমরা কেমন করে সামনে এগিয়ে যাব?

৪

স্কুল-কলেজের পর বিশ্ববিদ্যালয়। যে যা-ই বলুক, আমি এখনো বিশ্বাস করি আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে এই দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। একটা বিশ্ববিদ্যালয় খুব বড় ব্যাপার, একটা দেশকে পাল্টে দিতে পারে একটা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমাদের খুব দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশের এই সম্পদগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। এর কারণটি কী আমি এখনো বুঝতে পারিনি। যতই দিন

যাচ্ছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি এক ধরনের তাচ্ছিল্যভাব আরও বেশি করে ফুটে উঠছে। কেউ আর এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সমবেদনার চোখে দেখছেন না, দেখছেন সন্দেহের দৃষ্টিতে।

আমরা সাধারণ মানুষকে দোষ দিতে পারি না, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছিটেফোঁটা যে খবর বাইরে পৌঁছায় তা থেকে ভালো কিছু কল্পনা করা কি খুব সহজ? কিন্তু দেশের মানুষকে বুঝতে হবে, এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের দেশের অনেক বড় সম্পদ। শুধু ফুলবাড়ীর কয়লা খনি আর চট্টগ্রাম পোর্ট রক্ষা করলে হবে না, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও রক্ষা করতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার কী করতে পারে? শিক্ষক নিয়োগের জন্য এক ধরনের বিশেষজ্ঞ কমিটি থাকে, সবার আগে তাঁরা সেখানে চোখ বোলাতে পারে (আমি তাঁদের বলে দিতে পারি তাঁদের চোখ চড়কগাছ হয়ে যাবে। গত পাঁচ বছরে এই কমিটিগুলো কোন পর্যায়ে এসেছে সেটি না দেখলে তাঁরা বিশ্বাস করবেন না)। এই কমিটিগুলো পরিবর্তন করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে চ্যান্সেলরের হস্তক্ষেপ করতে হয়, আমাদের রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর। তিনি যখন দেশের ব্যাপারে পুরোপুরি অ্যাবাউট টার্ন করে ঠিক পথে উঠেছেন, তাহলে একই কমিটিগুলো পুনর্গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয়কে ঠিক পথে তুল দিতে এখন আর আপত্তি থাকার কথা নয়।

আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অনুরোধ করব, এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গত পাঁচ বছর কী ঘটেছে সেগুলো অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কী হবে জানি না, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তদন্ত করে তাঁরা যে নানা আনন্দের খোরাক পাবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমি প্রতি পদে পদে চিঠি লিখে রেখেছি, চিঠিগুলো পড়তে যেন কেউ বিরক্তি অনুভব না করেন, সেই বিষয়টি মাথায় রেখেছি। দেশের মানুষ শুনে অবাক হতে পারে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় গোষ্ঠী এসে রাত যাপন করত—আমরা ক্লাস নিতে পারতাম না, প্রতিবাদ করে কোনো লাভ হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পরও আমি সেসব গোষ্ঠী কারা, কেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রাত যাপন করত, জানার চেষ্টা করেছি, জানতে পারিনি। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে মুক্তবুদ্ধির জায়গা। অথচ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বী প্রার্থীদের কোনো স্থান ছিল না। কতজন যোগ্য প্রার্থী আবেদন করেছেন, শুধুমাত্র ধর্মের বিবেচনায় তার মধ্যে কতজন নেওয়া হয়েছে সেই তথ্যটি জানলে সাধারণ মানুষ শিউরে উঠবে।

গত পাঁচ বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের নামে কী পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে সেটি তদন্ত করে দেখা দরকার। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর থেকে আমরা এই দুর্নীতির তদন্ত করতে চাইছি। মুখে সেই ভয়ঙ্কর দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়, কিন্তু কাগজে-কলমে তদন্ত করে তার প্রকৃত রূপটি কেউ বের করতে রাজি নয়। আমি আশা করব, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জঞ্জাল পরিষ্কার করার প্রক্রিয়াটি যেন শুরু হয়।

আমরা মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, একটি নির্বাচিত সরকার এসে তার দলীয় লোককে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর তৈরি করবে এবং সেই ভাইস চ্যান্সেলর একেবারে গেটের দারোয়ান থেকে শুরু করে অধ্যাপক পর্যন্ত সবাইকে নিজের দলের মানুষ থেকে বেছে নেবেন। দুই নির্বাচিত সরকারের মাঝখানে অল্প কয়েক মাসের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসে, সেই সময়ে হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয়টুকু সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে যায়, তখন কোনো দল নেই, যে যোগ্য সে-ই দায়িত্ব পালন করে।

আমাদের খুব দুর্ভাগ্য, এই বিষয়টি কিন্তু এবারে ঘটেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে অনুরোধ, তাদের আমলে আমরা কয়েকটি মাস সত্যিকারের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে চাই। যখন প্রক্টর হবেন যোগ্য মানুষ, প্রভোস্ট হবেন যোগ্য মানুষ, সিন্ডিকেটে ডিন প্রতিনিধি হবেন যোগ্য মানুষ এবং যখন শিক্ষক নেওয়া হবে তখন একজন প্রার্থীকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে না কারণ তাঁর ধর্মটি ভিন্ন।

এটি খুব বেশি চাওয়া নয়, কিন্তু এটি চাওয়ার জন্যই আমাদের পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হয়—তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা কি সেটা জানেন?

প্রথম আলো
২৬ জানুয়ারি ২০০৭

তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং আমরা

কবি জসীম উদ্‌দীনের বাঙালি হাসির গল্পে একটা নাপিতের কাহিনী ছিল, ডাক্তারি বিদ্যা জানত না বলে লোকজনের ফোঁড়া-বিষফোঁড়া সে তার ক্ষুর দিয়ে ঘ্যাচ করে কেটে ফেলতে পারত। সব ডাক্তার মিলে যখন তাকে ডাক্তারি বিদ্যা শিখিয়ে দিল তখন সে আর ফোঁড়া কাটতে পারে না—কখন ইনফেকশন হয়ে যায়, কখন কোন রগ কেটে ফেলে সেই ভয়ে তার হাত কাঁপতে থাকে। আমার অবস্থা সেই নাপিতের মতো, রাজনীতির কিছু বুঝি না বলে বর্তমান অবস্থা দেখে আমার মহা আনন্দ। প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজ খুলি, নতুন কাকে কাকে জেলে ঢোকানো হয়েছে, সেটা দেখে আনন্দে বগল বাজাই। কোথায় কোথায় রিলিফের টিন পাওয়া গেছে এবং সেই টিন কে কীভাবে লুকানোর চেষ্টা করছে—সেটা দেখে আনন্দে হা হা করে হাসি। (রিলিফ চোরদের এই ধাক্কায় মনে হয় চুরি বিদ্যায় একটা ক্র্যাশ কোর্স হয়ে গেল, চুরি করার জন্য গম, চাল, শাড়ি কিংবা কম্বল খুব সহজ। প্রয়োজনে দ্রুত লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে যাওয়া যায়। চুরির জন্যে টিন ভাল নয় ঘরের ছাদে চুরির টিন একবার স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে নেওয়ার পর সেটা খুলে নিয়ে লুকিয়ে ফেলা মহা কঠিন কাজ!)

যাঁরা গভীরভাবে রাজনীতি বোঝেন তাঁরা অবশ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনেক কাজকর্ম খুব সহজভাবে দেখছেন না। আমি সব সময়ে একটু ভয়ে ভয়ে থাকি, যাঁরা ভালো রাজনীতি বোঝেন, তাঁরা না আবার আমাকে রাজনীতি বুঝিয়ে দেন তখন আর আমি এই নির্ভেজাল আনন্দটুকু থেকে বঞ্চিত হই! সরকারের প্রত্যেকটা পদক্ষেপে আমি তখন আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ এবং ষড়যন্ত্রের নীলনকশা এসব গুরুতর বিষয় খুঁজে পেতে থাকব। এ মুহূর্তে আমার সেটা নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা নেই, কারণ যাঁরা খুব ভালো রাজনীতি বোঝেন, তাঁদের কেউই কিন্তু ভবিষ্যৎবাণী করে বলতে পারেননি যে প্রায় হঠাৎই নতুন একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসে যাবে এবং একেবারে রাতারাতি দেশের রাজনীতির মোড় ঘুরে যাবে। "সংবিধান-সংকট" নামে

আমরা যে ভীতিকর আর্তচিৎকার শুনেছিলাম, সেই চিৎকার কেন এখন শুনি না? সদিচ্ছা থাকলে সবচেয়ে বড় সংকটও যে চোখের পলকে দূর করে ফেলা যায় আমরা কি সেটাই এবারে নতুন করে আবিষ্কার করলাম না? দেশের মানুষ এ মুহূর্তে খুব স্বস্তির মধ্যে আছে। অনেকেই মনে করেন, সেই একাত্তরে বাংলাদেশ গড়ে তোলার একটা সুযোগ এসেছিল— এতদিন পর আবার সে রকম একটা সুযোগ এসেছে। সবাই আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছে যে এ সরকার রাজনীতি থেকে দুর্বৃত্তদের খেদিয়ে দূর করে দেবে। নির্বাচন প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ করে দেবে, যেন অনেক কষ্ট করে পাওয়া গণতন্ত্রটি হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে যেতে পারে।

আমার নিজস্ব হিসাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখন পর্যন্ত যেসব বিষয়ে পরীক্ষা দিয়েছে, তার সবগুলোই খুব ভালো মার্কস পেয়ে পাস করেছে—তবে সব বিষয়ে এখনো পরীক্ষা দেয়নি। যে বিষয়গুলোয় পরীক্ষা দেয়নি তার কিছু কিছু খুব গুরুত্বপূর্ণ, আমরা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছি কখন সেই পরীক্ষাগুলো দেয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পরীক্ষাগুলো দিয়ে পাস করে বের হতে না পারে ততক্ষণ কেউ কিন্তু তাদের ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস আনতে পারবে না।

২

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গত কিছুদিনের কাজকর্ম দেখে এই দেশে রাজনীতিবিদেরা কীভাবে দুর্নীতি করেন, সে ব্যাপারে দেশের মানুষের একটা পরিষ্কার ধারণা হয়েছে। তবে দুর্নীতি এবং চুরি-চামারির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে ঢোকার সময় তাঁরা যেভাবে হাত উঁচু করে বিজয়ের V সাইন দেখিয়েছেন, সেটা আমাদের খুব ঘাবড়ে দিয়েছে। দুর্নীতি করাটুকু কি বিজয়? নাকি জেলখানায় ঢোকাটুকু বিজয়? কী সর্বনাশা কথা!

রাজনীতিবিদেরা এ দেশে খুব বড় বড় দুর্নীতি করতে পেরেছেন, তার কারণ এ দেশের আমলারা তাদের সেই দুর্নীতি করতে সাহায্য করেছেন। পুকুর চুরি বলে একটা কথা আছে, আমার ধারণা এই দেশে যা ঘটছে তার জন্য এই নিরীহ শব্দটা যথেষ্ট নয়, "সাগর চুরি" বা "মহাসাগর চুরি" জাতীয় শব্দ তৈরি করতে হবে। যেসব আমলা সাগর চুরি, মহাসাগর চুরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন— তাঁদের কখন ধরা হবে? দেশের দুর্নীতির কথা বললেই আমরা শুধু রাজনৈতিক নেতাদের কথা বলি—এ মুহূর্তে আমার তাঁদের জন্য একটু মায়াই লাগছে। সবাই তাঁদের সম্মানে গালাগাল করে

যাচ্ছে, তাঁরা মুখ ফুটে একটা কথাও বলতে পারছেন না! আমলারা কিন্তু একেবারে বহাল তবিয়তে আছেন, তাঁদের কথা কেউ বলছেন না। তাঁদের গ্রেপ্তার করে জেলে ঢোকানো হচ্ছে না, পত্রপত্রিকায় তাঁদের ওপর বিশাল-প্রতিবেদন ছাপা হচ্ছে না। ভালো লাগুক আর না-ই লাগুক গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের রাজনীতিবিদদের নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। তাঁদের ফেলে দিলে আমাদের কোনো লাভ নেই, কিন্তু তাঁদের সৎ রাজনীতি করতে বাধ্য করতে পারলে আমাদের লাভ আছে। কাজেই এককভাবে শুধু রাজনীতিবিদদের শাস্তি দিলে সমস্যার সমাধান হবে না, যে আমলাদের উৎসাহ-অনুপ্রেরণা আর সহযোগিতা নিয়ে তাঁরা এই দুর্নীতিগুলো করেন—তাঁদেরও শাস্তি দিতে হবে।

ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরদের আমলা ক্যাটাগরিতে ফেলা যায় কি না আমি জানি না, তবে আমি তাঁদের সেই ক্যাটাগরিতেই ফেলি। এমনিতে তাঁরা শিক্ষক, কিন্তু তাঁরা যে দায়িত্ব পালন করেন সেই দায়িত্বটুকু শিক্ষকের নয়, সেই দায়িত্বটুকু পুরোপুরি আমলার। যত যা-ই ঘটে থাকুক, সাধারণ মানুষের শিক্ষকদের জন্য অল্প হলেও একটু সম্মানবোধ রয়েছে। প্রাইভেট পড়িয়ে, কোচিং সেন্টার খুলে, টাকা নিয়ে প্র্যাকটিকেলে মার্কস দিয়ে, দল পাকিয়ে তাঁরা নিজেদের যত ক্ষতি করেছেন— আমার ধারণা, আমাদের শিক্ষক রাষ্ট্রপতি তাঁর দলীয় কাজকর্ম দিয়ে এক ধাক্কায় তার থেকে অনেক বেশি ক্ষতি করেছেন। একজন শিক্ষক প্রয়োজনে মাথা উঁচু করে থাকতে পারেন, নেতৃত্ব দিতে পারেন—সেই ধারণাটুকু ফিরিয়ে আনতে আমাদের অনেক দিন লাগবে বলে মনে হয়। যা-ই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমাদের আলাদাভাবে সরকারি আমলাদের সঙ্গে সময় কাটাতে হয় না, তবে ভাইস চ্যান্সেলর নামের আমলাদের সঙ্গে আমাদের দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা উঠবস করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় একটা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, একটা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অনেক স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতার ওপর ভর করে তারা অনেক বড় কাজ করতে পারে। আবার স্বায়ত্তশাসনের বর্ম পরে কোনো বড় কাজ না করে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ধরনের দুর্নীতি হতে পারে—দেশের সাধারণ মানুষ সেটা কল্পনাও করতে পারবে না। আমাদের মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে জানার পরও একজন ভাইস চ্যান্সেলর কী ধরনের কাজ করেন, তার একটু উদাহরণ দিই।

শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়ার সময় একটা কাগজে নিয়োগ পাওয়া সব শিক্ষকের নাম লিখে তার নিচে কমিটির সদস্যরা স্বাক্ষর করেন। কমিটির

মেম্বাররা চলে যাওয়ার পর ভাইস চ্যান্সেলররা মাঝখানের ফাঁকা অংশে আরও দুয়েকটি নাম লিখে ফেলেন! এর কারণ কখনো অর্থনৈতিক, কখনো দলীয় এবং কখনো কখনো দুটোই। এত বড় দুর্নীতির কিন্তু কোনো চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স নেই। কারণ বিষয়টা দেখার দায়িত্ব হচ্ছে সিন্ডিকেটের, সেই সিন্ডিকেটে তাঁরা নিজের দলের মানুষের বাইরে কাউকে ঢুকতে দেন না। সিন্ডিকেট নামে ব্যবসায়ীদের দুর্নীতির যে একটা নেতিবাচক শব্দ তৈরি হয়ে আছে ব্যাপারটা অনেকটা সে রকমই হয়ে গেছে। আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানি, পালাক্রমে একজন ডিনের সিন্ডিকেটে যাওয়ার কথা, কিন্তু গত পাঁচ বছরে সেখানে দলীয় মানুষের বাইরে কেউ ঢুকতে পারেননি। কেন পারেননি সেই প্রশ্নের জবাবও তাঁরা কখনো দেন না। জবাবদিহিতা বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কথা নেই।

এ ধরনের দুর্নীতির কথা কমিটির মেম্বারদের কাছে বলে কোনো লাভ নেই, সবাই দলীয় মানুষ। সবকিছু শুনেটুনে তাঁরা "দুষ্ট" ভাইস চ্যান্সেলরের ওপর হালকাভাবে বিরক্ত হন তার বেশি কিছু নয়। এ দেশের একজন বিখ্যাত অধ্যাপকের কথা আমি বলতে পারি, তাঁকে সবাই এক নামে চিনবে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ কমিটির তিনি একজন সদস্য। তাঁর হাতে নিয়োগ দেওয়া নিয়ে একটা জটিলতা তৈরি হয়েছিল সেটা নিয়ে কথা উঠতেই তিনি বললেন, "কী আশ্চর্য! অমুককে দেয়নি? আমি যে ভাইস চ্যান্সেলরকে বলে আসলাম?"

আমি তাঁর কথা শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, "বলে আসলাম মানে? আপনারা কাকে নিয়োগ দিয়েছেন, তার নাম লিখে নিজের নাম স্বাক্ষর করে আসেননি?" আমার এই একেবারেই শিশুসুলভ প্রশ্ন শুনে তিনি হঠাৎ অন্যদিকে তাকিয়ে অন্যজনের সঙ্গে অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে বলতে দ্রুত তাঁর গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। মূল ব্যাপারটা এ রকম, কমিটির সদস্যরা সাদা কাগজে নাম স্বাক্ষর করে ভাইস চ্যান্সেলরদের হাতে দিয়ে আসেন। ভাইস চ্যান্সেলররা সেখানে তাঁর নিজের দলের মানুষের নাম ঢুকিয়ে দেন। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই ঘটছে।

আমার খুব ভালো লেগেছে যে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়িত্বে এসেছেন সাবেক সেনাপ্রধান হাসান মশহুদ চৌধুরী। দেশের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থায় তিনি এ দেশের মানুষের আস্থা অর্জন করেছিলেন। দেশকে দুর্নীতির কবল থেকে মুক্ত করার কোনো একটি পর্যায়ে তাঁর কমিশন এ দেশের

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে নজর দেবে— আমি সেটি খুব আশা করে আছি।

৩

আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন উপদেষ্টা বলেছেন, এই দেশে এ মুহূর্তে নির্বাচন বা গণতন্ত্র থেকে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে সুশাসন। ঠিক কীভাবে কথাটি বলা হয়েছে এবং কীভাবে আমাদের কানে এসেছে আমার ধারণা নেই, হতে পারে বিষয়টি যখন যেখানে বলা হয়েছিল তার আগে এবং পরে যেসব কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে বিবেচনা করা হলে কথাটির একটি অর্থ হয়, কিন্তু আলাদাভাবে শোনা হলে অবশ্যই কথাটি খট করে কানে লাগে। আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার যত জনপ্রিয় সরকারই হোক না কেন তারা কিন্তু নির্বাচিত সরকার নয়। অবশ্যই আমরা সুশাসন পেতে চাই, কিন্তু আমরা সেটা পেতে চাই নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে। নির্বাচিত সরকার একটা সুস্থ রাজনীতির ভেতর থেকে উঠে আসুক এবং সেই ব্যাপারটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমাদের জন্য নিশ্চিত করে দিক, তাহলেই আমরা অসম্ভব খুশি হয়ে যাব। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছ থেকে অল্প কয়েক মাসের জন্য সুশাসন পেয়ে আমাদের অভ্যাস খারাপ হয়ে গেলে লাভের থেকে ক্ষতি বেশি হবে! সংবাদপত্র এবং রেডিও-টেলিভিশন স্বাধীন থাকুক, বিচার বিভাগ নিরপেক্ষ থাকুক, দেশের মানুষ সচেতন থাকুক তাহলেই দেশে গণতন্ত্রের ভিত পাকা হবে। যেসব দুর্নীতিবাজকে ধরা হয়েছে তাদের বিচার করার ব্যাপার আছে, বিচারে যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপার আছে—এই কাজগুলা যত দ্রুত সম্ভব শেষ করে একটা নির্বাচন দিয়ে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্মান এবং দেশের মানুষের ভালোবাসা নিয়ে তাদের আগের জায়গায় ফিরে যাবে— সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একজন উপদেষ্টার কথা শুনে মনে হতে পারে আমাদের পাওনা বুঝি একটি, হয় সুশাসন তা না-হয় গণতন্ত্র। আমরা যেন একই সঙ্গে দুটিই দাবি করতে পারি না! আমি সেটা মানতে রাজি নই, আমাদের দুটোই চাই, একই সঙ্গে। সুশাসনের লোভ দেখিয়ে সারা জীবন গণতন্ত্রকে একটা সোনার হরিণ বানিয়ে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই না। গণতন্ত্র চর্চার যে যন্ত্রণাগুলো আছে তার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে চাই, যেন আমরা না পেলেও আমাদের ছেলেমেয়েরা এটি ভোগ করতে পারে।

৪

ফেব্রুয়ারি মাসটা আমাদের খুব প্রিয় সময়। যে ঘটনাটি দিয়ে এটি শুরু হয়েছিল সেই একুশে ফেব্রুয়ারির সঙ্গে শোকের ব্যাপারটা ছিল, এতদিন পর কিন্তু সেই শোক ছাপিয়ে বিজয়টাই বেশি চোখে পড়ে। ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকাবাসীর জন্য একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে বইমেলা। ঢাকা এলে আমি বইমেলায় ঢুঁ মেরে যাই। বইমেলার কারণে এ মাসে আমরা যারা লেখালেখি করি তাদের কদর একটু বাড়ে। সাংবাদিকেরা আমাদের কথাবার্তা শুনেন, আমাদের ইন্টারভিউ নেন। তাঁদের খুব একটা প্রিয় প্রশ্ন—"এই বইমেলায় আপনি কি আলাদা করে কিছু দেখছেন?" আমাকেও অনেকবার এই প্রশ্ন করা হয়েছে এবং আমি একেকবার একেকভাবে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। তবে আমার ধারণা, এবারের বইমেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের মুখে নির্ভাবনার একটা স্বতঃস্ফূর্ত চিহ্ন। বাবার হাত ধরে মা, মায়ের হাত ধরে ছোট শিশু মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—দৃশ্যটি খুব সুন্দর!

যারা আসে তারা সবাই যে বই কিনতে পারে, তা না। বইয়ের অসম্ভব দাম, যে টাকা দিয়ে সন্তানের একটি জামা কিনে দিতে পারবে সেই টাকা দিয়ে সন্তানের জন্য একটা বই কিনতে গিয়ে তাদের অনেক বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়। বইয়ের লেখক হিসেবে আমাকেও অনেকবার এই দীর্ঘশ্বাস শুনতে হয়েছে। আমরা চাই ছেলেমেয়েরা বই পড়ুক, কিন্তু বইয়ের দাম যদি সাধ্যের বাইরে হয় তাহলে তা কেমন করে বই পড়বে? সমস্যাটা নিয়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র চিন্তাভাবনা করেছে এবং তারা একটা সমাধানও বের করেছে, অনেক পুরোনো সমাধান—সেটা হচ্ছে লাইব্রেরি। শৈশবে আমরা অনেক বই পড়েছি, কারণ তখন স্কুলে বিশাল লাইব্রেরি ছিল, কেউ কি জানে ১৯৮৬ সাল থেকে স্কুলের লাইব্রেরিয়ান পদটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে; এখন স্কুলে আর লাইব্রেরি নেই! মাঝেমধ্যে কোনো স্কুলে তালাবদ্ধ লাইব্রেরির দেখা পাওয়া যায়, কিন্তু সেই লাইব্রেরি বোঝাই ধুলায় ঢাকা রাজনৈতিক নেতাদের জীবনী আর ধর্মের বই দিয়ে। সেই বইগুলো স্কুলের লাইব্রেরিকে গছিয়ে দিয়ে ভুঁইফোড় লেখক-প্রকাশকেরা টু-পাইস কামাই করে থাকতে পারেন, কিন্তু স্কুলের ছেলেমেয়েদের কোনো লাভ হয়নি! তারা ভুলেও কখনো, কোনোদিন লাইব্রেরির সেই বইগুলো ছুঁয়ে দেখেনি!

দলীয় সরকার এলে আবার তারা স্কুলগুলোয় অর্থহীন কিছু বই গছিয়ে দেবে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই অশুভ চক্রটি কি কোনোভাবে

ভাঙা যায় না? একটা স্কুলের শিশুরা কি তাদের পছন্দের বই পড়তে পারে না ডিটেকটিভ কিংবা রহস্য কিংবা ভৌতিক? আমরা যে রকম পড়েছি? বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে যদি দেশের এত হাজার হাজার ছেলেমেয়েকে বই পড়াতে পারে তাহলে একটা রাষ্ট্র কি দেশের সব ছেলেমেয়েকে বই পড়াতে পারবে না? যে বই পড়ে শিশুরা আনন্দ পায়!

৫

আমি একটা জিনিসের জন্য খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। এ দেশের সবাই জানে আমরা দুর্নীতিতে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছি। চ্যাম্পিয়ানশিপটা যখন হাতছাড়া হয়েছে, সেখানে আমাদের কোনো কৃতিত্ব ছিল না অন্যেরা আমাদের থেকেও বেশি দুর্নীতিবাজ ছিল বলে মেডেলটা তারা ছিনিয়ে নিয়েছে।

এ বছরটিতে কী হয় দেখার জন্য আমি বসে আছি। এখন পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেভাবে দেশ চালাচ্ছে এবং আগামী কয়েক মাস যেভাবে চালাবে বলে আমরা আশা করে আছি তাতে আমরা আশা করতে পারি বহু দিন পরে আমরা একটা সম্মানজনক অবস্থায় পৌঁছাব। আমরা এই দেশের ছেলেমেয়েদের বলব, "এখন তোমরা আমাদের কথা বিশ্বাস করেছ? আমরা বলেছি না, এই দেশের সাধারণ মানুষ খুব ভালো, অল্প কজন দুর্বৃত্তের জন্য আমাদের এত বড় অসম্মান! এই দুর্বৃত্তদের জেলখানায় ঢোকানোর পর দেখো এক লাফে আমরা কোথায় উঠে গেছি।"

আমি এখন থেকেই টিআইবির রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছি—আমার আর সময় কাটছে না।

প্রথম আলো
১ মার্চ ২০০৭

উচ্চ শিক্ষায় বাংলা পাঠ্যবই

সূচনা

কিছুদিন আগে বাংলাদেশের খুব বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর একজন মালিকের সাথে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল, তিনি কথা প্রসঙ্গে আমাকে বললেন, "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সমস্যা কী জানেন? তারা ইংরেজি জানে না। কিছুদিন আগেও আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে মানুষ এনেছি। এখন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়েছে বলে রক্ষা, ইংরেজি জানা মানুষ এখন আর বাইরে থেকে আনতে হয় না।"

আমি তার সাথে তর্ক করিনি, তিনি এতো বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক কাজেই তিনি কি বলছেন নিশ্চয়ই সেটা জানেন। তার বক্তব্যটিতে যে সত্যতা আছে আমি সেটাও আঁচ করতে পারি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে মাঝে মাঝেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়, আমি লক্ষ্য করেছি সেখানে সকল অনুষ্ঠানে সবাই ইংরেজিতে কথা বলে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ঠিক করে নিয়েছেন তারা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজিতে চৌকস করে গড়ে তুলবেন, ক্লাশে বাংলা পাঠ্যপুস্তক পড়াতো দূরে থাকুক সেখানে বাংলায় লেকচার দেয়া পর্যন্ত বোধহয় বেআইনী কাজ। ঠিক এ রকম সময় পাবলিক কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালগুলোতে আমরা যদি বাংলায় উচ্চ শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করি এবং বলতে সংকোচ হচ্ছে তবুও বলি, ভবিষ্যতের পথ রুদ্ধ করে দিই তাহলে আমরা কী জাতির বড় কোনো উপকার করব? উচ্চ শিক্ষাস্তরে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনার চতুর্থ পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে লেখা আছে "প্রকল্পের আওতায় গল্পসমূহ প্রকাশিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ মহাবিদ্যালয়সমূহে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যায়নরত অধিকাংশ শিক্ষার্থী বাংলা ভাষায় ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বর্তমানে শিক্ষার্থীগণ কোন ভাষায় নিজেদের প্রস্তুত করবেন সে বিষয়ে আর দ্বিধাগ্রস্ত নন। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ তাঁদের হাতে পৌঁছার পর তারা

এরূপ দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়াও প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার কারণে বাংলা ভাষায় প্রণীত গ্রন্থের অপ্রতুলতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকবৃন্দের বর্তমান শ্রেণীকক্ষে বাংলায় বক্তৃতা দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারের বিঘোষিত নীতিও সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে।"

আমি মনে করি এই মূল্যায়ন প্রতিবেদনে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তার সবগুলো সত্যি নয়। প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাংলায় উচ্চ শিক্ষা দিতে আগ্রহী সেটি সঠিক নয়, বাংলা একাডেমীর প্রকাশিত পাঠ্যবইগুলো দেশে পাঠ্যবইয়ের অভাব হ্রাস করেছে সেটাও অতিরঞ্জিত কথা। আমরা এই প্রকল্পের কারণে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি সেটিও আমি বিশ্বাস করি না।

আমি একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক, একজন বিভাগীয় প্রধান এবং ডিন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা দেবার একটা বড় দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হয়। আমি নিজে যখন ক্লাশ নিই ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু একটা বোঝানোর জন্যে আমি প্রয়োজনে বাংলায় কথা বলি কিন্তু তাদের মূল শিক্ষাটা দিই ইংরেজিতে। তাদের পরীক্ষায় লিখতে হয় ইংরেজিতে এবং তাদের জন্যে যে পাঠ্য বইটি বেছে দিই সেটিও সব সময় হয় ইংরেজিতে। ইংরেজি ভাষায় এতো চমৎকার সব পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সে আমি যদি শিক্ষক হিসেবে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সেগুলো তাদের হাতে তুলে না দিই সেটা হবে একটা বড় অপরাধ। আমার ছাত্র-ছাত্রীদের বিষয়ের জ্ঞানটুকু যেরকম গুরুত্বপূর্ণ, ইংরেজি ভাষার জ্ঞানটুকুও প্রায় সেরকম গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চাকরিক্ষেত্রে সবাই আশা করে তারা ইংরেজিতে রিপোর্ট লিখতে পারবে, ই-মেইলে দেশে-বিদেশে যোগাযোগ করতে পারবে এবং প্রয়োজনে ইংরেজিতে বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবে। যে দেশ পুরোপুরি দাঁড়িয়ে গেছে সেই দেশ সবকিছু নিজের ভাষায় করতে পারে কিন্তু আমাদের দেশের মতো একটি দেশ যেটি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে তাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তির জন্যে অন্যদেশ এবং সেই দেশের ভাষার উপরে নির্ভর করতে হয়। এখানে ইংরেজিটা শুধু ভাষা নয়, এটি একটি প্রযুক্তি।

আমার ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজিতে উচ্চ শিক্ষা দিতে আমার ভেতরে কোনো অপরাধবোধ কাজ করে না। আমি জানি এই দেশে স্নাতক পর্যায়ে

যাবার আগে তারা বারো বৎসর ধারাবাহিকভাবে ইংরেজি পড়ে। যে ছাত্র বা ছাত্রী বারো বৎসর ইংরেজি পড়েছে তাদের ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক পড়তে কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। (দুর্বল শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে আসলে বড় ধরনের সমস্যা হয়)। আমি জানি ইংরেজিতে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি শিক্ষা নিলে তারা দেশ ও পৃথিবীর জন্যে একটা সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার পরেও আমাদের ইংরেজিতে পড়ানোর মত শিক্ষক আছে, অত্যন্ত চমৎকার ইংরেজি পাঠ্যবই আছে এবং প্রয়োজনে ইন্টারনেটে একটা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ আছে এরকম অবস্থায় আমি কেন তাদেরকে ইংরেজি মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা দেব না?

তাই যুক্তি সঙ্গত কারণেই আমার প্রশ্ন আমরা তাহলে কাদের জন্যে বাংলা পাঠ্যবই তৈরি করছি?

উচ্চ শিক্ষাস্তরে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশন (৫ম পর্যায়) প্রকল্পের সারপত্রের শুরুতেই এই প্রশ্নের উত্তরটি এভাবে দেয়া হয়েছে "স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষায় পাঠ্য ও সহায়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করে শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।"

এ ধরনের একটি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য আমি একটু ভিন্নভাবে দেখতে আগ্রহী। আমি মনে করি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এবং বাকী পৃথিবীর সাথে সম্পৃক্ত করে রাখার জন্যে উচ্চ শিক্ষা যতটুকু সম্ভব ইংরেজিতে দেয়া উচিত। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জটিল বিষয়গুলো বোঝার জন্যে সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে বাংলা পাঠ্যবই অবশ্যই লেখা যেতে পারে। পরিকল্পনাহীনভাবে না লিখে যারা শিক্ষাদান করেন তাদের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনীয় বইয়ের তালিকা করে সেই বইগুলো প্রণয়ন করা যেতে পারে। এই মুহূর্তে মৌলিক কোনো বই লেখা যদি সম্ভব নাও হয় আমি মনে করি চমৎকার সব পাঠ্য বইগুলো অনুবাদ করে নেয়া যেতে পারে। পুরোপুরি আমাদের দেশজ কোনো বিষয় অবশ্যি খুঁজে পাওয়া সম্ভব হতে পারে যেটি বাংলা ভাষায় পড়ানো যেতে পারে এবং তার জন্যে বাংলা ভাষায় পাঠ্যবই প্রণয়ন করা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করতে পারি।

আমি অবশ্যি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি কারণে এই প্রকল্পটিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। আমাদের প্রিয় ভাষাটি পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ভাষাগুলোর একটি। এই ভাষায় বিশ্বমানের সাহিত্য রচনা করা হয়েছে কিন্তু আমার ধারণা ভাষাটিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি লেখার জন্যে প্রস্তুত করা হয় নি। কোন

ধরনের সংস্কার করে যেরকম গণতন্ত্র চাপিয়ে দেয়া যায় না, গণতন্ত্রকে বিকশিত করতে হয় ক্রমাগত চর্চার মাধ্যমে, এখানেও তাই। ভাষার সংস্কার করে আমরা সেটাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্যে প্রস্তুত করতে পারব না আমাদের সেটি করতে হবে ক্রমাগত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপরে বই এবং পাঠ্যবই লিখে। শুধুমাত্র এই একটি কারণেই আমি মনে করি এই প্রকল্পটিকে সাফল্য লাভ করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষা বনাম মাধ্যমিক শিক্ষা

এই প্রকল্পটির নাম যদি "উচ্চ শিক্ষাস্তরে বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশন" না হয়ে "মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশন হতো" তাহলে আমি আরও অনেক বেশি আগ্রহ নিয়ে এর পিছনে দাঁড়াতাম। যদিও আমাদের প্রচলিত ধারণা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বাংলা পাঠ্যবই আছে, আমি মনে করি সেটি যথেষ্ট নয়। একজন শিক্ষার্থী শুধুমাত্র নিজের মাতৃভাষাতেই তার বিষয়টা সঠিকভাবে বুঝতে পারে কাজেই মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে আরো বেশি এবং আরো চমকপ্রদ পাঠ্যপুস্তক রচনা করার সুযোগ আছে। আজকাল স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা প্রায় সবাই প্রাইভেট পড়ে। যে বিষয়টি প্রাইভেট পড়ে বা অন্য একজন শিক্ষকের কাছ থেকে বুঝে নিতে হয় সেটা যদি আরেকটা সহায়ক বই থেকে বুঝে নিতে পারতো তাহলে সেটা হতো অত্যন্ত চমৎকার একটা বিষয়। দুর্ভাগ্যক্রমে মুখস্থ করে বেশি নম্বর পাওয়ার জন্যে অসংখ্য গাইড বই থাকলেও একটা বিষয় বোঝার জন্যে সহায়ক বই বলতে গেলে একেবারেই নেই।

বাংলা ভাষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

আমি ভাষাবিদ নই তাই একটা ভাষার সৌন্দর্য বা শক্তি বিশ্লেষণ করতে পারি না, তবে যে দুটো ভাষা জানি সে দুটোকে নানাভাবে তুলনা করার এক ধরনের ইচ্ছে হয়। যে বিষয়টা আলাদাভাবে চোখে পড়েছে, সেটা এ রকম : ইংরেজিতে আমি যখন বলি "I love you" তখন শুধু এভাবেই বলতে হয়। শব্দগুলো ওলট পালট করে love you I বা I you love বললে বাক্যটা অর্থহীন হয়ে যায়। সে তুলনায় বাংলা ভাষা অনেক সহনশীল "আমি তোমাকে ভালবাসি" এই বাক্যটার তিনটা শব্দকে ওলট-পালট করে যে ছয়টা বাক্য তৈরি করা যায় তার প্রত্যেকটাই কিন্তু গ্রহণযোগ্য বাক্য! যেমন

আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি ভালবাসি তোমাকে, তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমাকে ভালবাসি আমি, ভালবাসি আমি তোমাকে এবং ভালবাসি তোমাকে আমি! ভাষার এই সহনশীলতার জন্যে আমার ধারণা বাংলা ভাষায় কবিতা লেখা অনেক সহজ এবং মনে হয় সে কারণেই এমন বাঙালি একজনকে খুঁজে পাওয়া যাবে না যে কখনো না কখনো কবিতা লেখার চেষ্টা করে নি।

বিজ্ঞান লেখার সময় কিন্তু ব্যাপারটা পুরোপুরি অন্যরকম। আমি দেখেছি বিজ্ঞানের কোন বিষয় ইংরেজিতে প্রকাশ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। উদাহরণ দেবার জন্যে স্নাতক পর্যায়ের একটা পদার্থবিজ্ঞান বই থেকে একটা বাক্য তুলে নেয়া যাক : This same gravitational force, with the same magnitude, still acts on the body even when the body is not in free fall, say, at rest on a pool table or moving across the table. এটাকে যদি সরাসরি বাংলায় লিখতে চাই তাহলে আমাকে লিখতে হবে : এই একই মহাকর্ষজনিত বল তার সমান পরিমাণে বস্তুটার উপর ক্রিয়া করবে, যদি বস্তুটা মুক্তভাবে নিচে নাও পড়ে কিংবা কোনো টেবিলে স্থির থাকে কিংবা টেবিলে গতিশীল হয়।

দেখাই যাচ্ছে এই বাংলা অনুবাদটা স্বচ্ছন্দ নয়, এটাকে সাবলীলভাবে লিখলে আসলে লেখা উচিত : বস্তুটা মুক্তভাবে নিচে পড়তে থাকুক আর নাই পুড়ক, টেবিলে স্থির থাকুক আর নাই থাকুক সবসময়ই তার উপর একই পরিমাণ মাধ্যাকর্ষণ বল কাজ করবে।

মনে হতে পারে সুন্দর অনুবাদ হয়েছে কিন্তু একটু খুটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এভাবে লেখার কারণে বাক্যের গুরুত্বটা সঠিক জায়গা থেকে সরে গেছে। সঠিক জায়গায় গুরুত্ব রাখতে হলে একটা বাক্যকে আসলে ভেঙ্গে দুটো বাক্যে লিখতে হবে : একটা বস্তুর উপর একটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তার সমান পরিমাণে কাজ করবে। বস্তুটা মুক্তভাবে পড়ুক অথবা নাই পড়ুক, টেবিলে স্থির থাকুক আর নাই থাকুক সবসময়ই সেটা সত্যি।

কেউ যেন মনে না করে এই বিশেষ বাক্যটির কারণে এটা হয়েছে, আসলে এটা প্রায় সব সময়েই সত্যি। বাংলায় বিজ্ঞানের বিষয়গুলো না লেখার কারণে এটা বিজ্ঞান লেখার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠে নি। আমরা যখন লিখতে চাই এটা প্রায় সময়েই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়। বাংলা একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক লেখার প্রকল্পে লেখা একটা বই থেকে একটা বাক্য পড়ে শোনানো যাক :

পলিনিউক্লিওটাইড সূত্র দুটি তাদের কুণ্ডলীর সজ্জায় পরস্পর হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা বিপরীত সূত্রের ক্ষারের মাধ্যমে যুক্ত, ফলে উৎপন্ন ক্ষারক—জোড় দুটি শিকলের অক্ষের উল্লম্ব ঠিক ঘূর্ণিত সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে অবস্থান করে।

এটি কোন বিষয়ে লেখা হয়েছে সেটা জানার পরেও বাক্যটির অর্থ বুঝতে আমার যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। আমার ধারণা এক বাক্যে পুরোটি না লিখে এটাকে কয়েকটা বাক্যে ভেঙ্গে লিখলে এটা বোঝা অনেক সহজ হতো :

পলিনিওক্লিওটাইড দুটো সুতার মত একটা আরেকটাকে প্যাচিয়ে থাকে। দুটি সুতার একটার ক্ষারক অন্যটার বিপরীত ক্ষারকের সাথে হাইড্রোজের বন্ড দিয়ে আটকে থাকে। এই ক্ষারকের জোড়গুলো দেখায় ঘুরে ঘুরে উঠে যাওয়া একটা সিঁড়ির ধাপগুলোর মতো।

কাজেই আমি বিশ্বাস করি বাংলা ভাষায় জটিল বিজ্ঞানের বিষয় লেখা সম্ভব কিন্তু আমরা এখনো সেভাবে লিখিনি বলে ভাষাটা পুরোপুরি প্রস্তুত হয় নি। আমরা যত বেশি লিখব এবং যত বেশি পড়ব ভাষাটা ততই প্রস্তুত হতে থাকবে। এই দায়িত্বটি আসলে পুরোপুরি আমাদের।

বিজ্ঞান লেখার ওয়ার্ড প্রসেসর

আজকাল সকল লেখালেখিই হয় ওয়ার্ড প্রসেসর দিয়ে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির পাঠ্যবইগুলো লেখার জন্যে সারা পৃথিবীতেই যে ওয়ার্ড প্রসেসরটি ব্যবহার করা হয় তার নাম Latex (উচ্চারণ লেটেক), আমাদের খুব দুর্ভাগ্য এই সফটওয়ারটি ব্যবহার করার জন্য ইউনিকোডে ব্যবহার উপযোগী প্রয়োজনীয় বাংলা ফন্ট আমরা এখনো তৈরি করে ফেলতে পারি নি। বিষয়টি জটিল নয়, এর জন্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা করে এটি শেষ করার একটা উদ্যোগ প্রয়োজন। বাংলা একাডেমীর "উচ্চ শিক্ষাস্তরে বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশন" প্রকল্পের আওতায় যদি বাংলায় ব্যবহার উপযোগী Latex-কে ছাড়া করিয়ে নেয়া হতো তাহলে সেটি এই জাতির জন্যে অনেক বড় একটি উপকার হতো।

বাংলা এবং ইংরেজি সংখ্যা

আমরা বাংলা লেখার সময় যথেচ্ছভাবে ইংরেজি ব্যবহার করি, একই বাক্যের কিছু ইংরেজিতে এবং কিছু বাংলাতে লিখতেও সংকোচ বোধ করি না। শিক্ষক হিসেবে খাতা দেখার সময় একজন ছাত্র তার খাতায় রোল নম্বর

হিসেবে বাংলায় ২৭৪ লিখেছে নাকি ইংরেজিতে 298 লিখেছে সেটি আমার জন্যে সত্যি সত্যি একবার একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিজ্ঞানের সমীকরণ লেখার জন্যে আমাদের ইংরেজি (এবং গ্রীক) অক্ষর ব্যবহার করতে হয় এবং সংখ্যাগুলো লিখি ইংরেজিতে। অন্যদের কথা জানি না বাংলাতে বিজ্ঞান বা গণিতের কিছু লিখতে হলে আমি সবসময়েই সংখ্যাগুলো ইংরেজিতে লিখি। স্কুলের বিজ্ঞান বইগুলোতেও এখন এটি একটি প্রচলিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার মনে হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত লেখালেখিতে ইংরেজি সংখ্যা ব্যবহার করার এই বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে নিলে আমরা সবাই স্বস্তি অনুভব করব।

পরিভাষা

আইনস্টাইনকে আমরা কখনো বাংলায় আয়েন উদ্দিন লিখি না সেরকম নিউটনকেও নিয়ামত উল্লাহ লিখি না তাহলে আমরা কেন চার্জকে আধান বলি কিংবা রেজিস্টেন্সকে রোধ বলি সেটা আমি কখনো বুঝে উঠতে পারি না। বিজ্ঞানের প্রচলিত শব্দগুলোর বাংলা পরিভাষা তৈরি করার বিষয়টিকে নিয়ে আমরা অনেককেই হই চই করতে দেখেছি কিন্তু আমার মনে হয়েছে পরিভাষা বিজ্ঞান শিক্ষাকে কোনো সাহায্য তো করেই না বরং উচ্চ শিক্ষাকে পিছনে টেনে রাখে। ভাষা একটা অত্যন্ত গতিশীল এবং প্রায় জীবন্ত একটি বিষয়, নিয়মিতভাবেই ভাষায় নতুন নতুন শব্দ যুক্ত হতে থাকে। কাজেই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির শব্দগুলো যদি হুবহু বাংলা ভাষায় স্থান করে নেয় তাহলে সেগুলো আমাদের বাংলা ভাষাকে বিজ্ঞান বান্ধব ভাষায় রূপান্তর করে দেবে। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শেখার সময় এই শব্দগুলোর সাথে পরিচিত হবে এবং পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার সময় বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক জগতে পা ফেলতে পারবে। আমি মনে করি বিজ্ঞানের শব্দগুলো—সেটা গ্রীক, ইংরেজি ফরাসী বা জার্মান যে ভাষাতেই থাকুক না কেন, অবিকৃতভাবে গ্রহণ করার মাঝে কোনো লজ্জা নেই, বরং না গ্রহণ করার মাঝে এক ধরনের হীনমন্যতা আছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা যখন কোনো কিছু আবিষ্কার করে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে একটি শব্দ উপহার দেবেন তখন বাইরের পৃথিবীও সেটাকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করবেন। পৃথিবীর সকল কণাকে ফারমিওন ও বোজন এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। বোজন শব্দটি এসেছে সত্যেন বোসের "বোস" নামটি থেকে। আন্তর্জাতিক জগৎ

সেটাকে বোস হিসেবেই রেখেছেন, শুধুমাত্র কণা বোঝানোর জন্যে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পায়োন, হ্যাড্রন-এর সাথে মিল রেখে বোসন বা বোজন তৈরি করেছেন। বোসকে বুশ তৈরি করা হয় নি! একইভাবে পৃথিবীর সবাই এখন গ্রামীণ ব্যাংক শব্দটার সাথে পরিচিত, তারা কিন্তু বাংলা "গ্রামীণ" শব্দটাকে ইংরেজি "Village related" ধরনের কোনো প্রতিশব্দ দিয়ে পাল্টে দেয় নি। পৃথিবীর শব্দভাণ্ডারে "গ্রামীণ" নামে একটা বাংলা শব্দ যুক্ত হয়েছে।

কাজেই আমাদের পরিভাষার পেছনে ছোটার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না, বিজ্ঞানের শব্দগুলো আমরা অবিকৃতভাবেই শিখতে চাই।

উপসংহার

উচ্চ শিক্ষাস্তরে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশন প্রকল্পটি তার ৫ম পর্যায়ে পৌঁছেছে যার অর্থ এটি সফলভাবে আগের চারটি পর্যায় শেষ করছে। আমরা আশা করব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটি পর্যালোচনা করে দেশের প্রয়োজনের কথাটুকু মনে রেখে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

বাংলা একাডেমী কর্তৃক অনুষ্ঠিত "উচ্চ শিক্ষাস্তরে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা : অবস্থা, সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থাপিত।
২৩.০৬.২০০৭

মার্চের ভালোবাসা

বিকেলে আমি আমার অফিসে বসে ছাত্রছাত্রীদের হোমওয়ার্কের খাতা দেখছি, তখন হঠাৎ করে আমার টেলিফোন বেজে উঠল। আমি ফোন ধরেছি, অন্য পাশে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা একজন ছাত্রী। সে সৌজন্যের কয়েকটা কথা বলল, আমিও তার একটু খোঁজখবর নিলাম—কোথায় আছে, কী করছে ইত্যাদি। তার কাছে জানতে পারলাম একটা কিন্ডারগার্টেনের কাজ করত, এখন একটা এনজিওতে আছে। খানিকক্ষণ কথা বলে সে বলল, "স্যার মনটা খুব খারাপ লাগছে, তাই আপনাকে ফোন করেছি।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মন খারাপ কেন? কী হয়েছে?" ছাত্রীটি প্রথমে কিছু বলতে চাইছিল না। আমি একটু জোর করায় ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল। বলল, "স্যার আমি অনার্স পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিলাম।" আমি একটা ধাক্কা খেলাম, একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্সে ফার্স্ট হয়ে একজন ছাত্রীকে কিন্ডারগার্টেনে মাস্টারি করতে হয়? আমি জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, "স্যার আমি যখন অনার্সে ফার্স্ট হলাম, তখন ডিপার্টমেন্টের টিচাররা মাস্টার্সে আমার সর্বনাশ করিয়ে দিল। আমাকে আর ফার্স্ট হতে দিল না।" ছাত্রীটি যে ডিপার্টমেন্টের কথা বলেছে, সেই ডিপার্টমেন্টে এ ধরনের কাজ নিয়মিতভাবে হয়, এর মধ্যে কোনো লুকোছাপা নেই। গত পাঁচ বছরে এ দেশে একটা ব্যাপার ঘটেছে—অন্যায়, অবিচার, নিষ্ঠুরতা আর লুকিয়ে বা গোপনে করতে হতো না। ছাত্রীটি ভাঙা গলায় বলল, "ইউনিভার্সিটির টিচার হওয়ার স্বপ্ন ছিল স্যার। আমি ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, আমাকে নেয়নি। যাদের নিয়েছে তারা আমার থেকে অনেক খারাপ, তাদের একটাই যোগ্যতা তারা ওদের দল করে! আমি সবার চেয়ে ভালো, আমি বিতর্ক করি, আবৃত্তি করি, গান করি, নাটক করি, অথচ আমাকে কিন্ডারগার্টেনে মাস্টারি করতে হয়?" মেয়েটি হঠাৎ হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল।

তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো একটি কথাও আমার জানা ছিল না। আমি তারপরেও সান্ত্বনা দিয়ে কয়েকটি কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। মেয়েটি আমার কাছে কোনো সাহায্য চায়নি, কারও বিরুদ্ধে সে কোনো অভিযোগ করেনি, তার ছোট জীবনের শুরুতেই এত বড় একটা অবিচারের কথাটুকু আমাকে বলে একটু হালকা হতে চেয়েছিল, তার বেশি কিছু নয়। টেলিফোনে কথা বলা শেষ করে দীর্ঘ সময় আমি কাজে মন দিতে পারিনি। আমি বুঝতে পারছিলাম বাংলাদেশে এ বয়সের একটা প্রজন্ম বড় হয়েছে, যারা জানে পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত, সবচেয়ে ধিকৃত, দুর্বৃত্তদের সবচেয়ে বড় যে আখড়া তার নাম হচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। আমি শত চেষ্টা করেও তাদের সেই বিশ্বাসটুকুর পরিবর্তন করতে পারব না।

বাংলাদেশকে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মুক্ত করার একটা প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে, আমার খুব জানার ইচ্ছা করে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি বাংলাদেশের বাইরে? তাহলে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দুর্বৃত্তদের হাত থেকে কখন মুক্ত করা হবে?

আমার খুব হাসি পায় যখন দেখি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের হর্তাকর্তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি আর অনিয়ম খোঁজার জন্য ছোটাছুটি করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য কারা? তাঁরা তাঁদের কোন মহান কীর্তি দেখিয়ে এই কমিশনের সদস্য হয়েছেন? কেন তাঁরা অবলীলায় মিথ্যা কথা বলেন? গত পাঁচ বছর তারা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য কোন কাজটি করেছেন? এখন হঠাৎ করে তাঁরা কীভাবে ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে গেলেন যে অন্যের দুর্নীতি আর অনিয়ম যাচাই করার নৈতিক অধিকার অর্জন করে ফেলেছেন? হারিছ চৌধুরীর দুর্নীতির বিচার করার জন্য আমরা যদি মোসাদ্দেক আলী ফালুকে দায়িত্ব না দিই, তাহলে কেমন করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দুর্নীতির বিচারের দায়িত্ব দিচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে? এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

দেশের সম্পদ বলতে আমরা শুধু টাকা-পয়সাকে বুঝি। তাই যারা টাকা-পয়সা লুটপাট করেছে সবাই তাদের ধরে ধরে জেলে ঢোকাচ্ছে। লেখাপড়াটা টাকা-পয়সা থেকে অনেক বড় সম্পদ, যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধ্বংস করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে, তারা কিন্তু দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ ধ্বংস করেছে। তাহলে তাদের কেন কেউ ধরছে না? দেশের সব প্রতিষ্ঠান থেকে জোট সরকারের দলীয় প্রশাসনকে সরানো হয়েছে, তাহলে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন বাকি রইল?

২

জোট সরকারের আমলে যাঁরা ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছেন, তাঁদের বেশির ভাগ রাজাকার টাইপের মানুষ। ছাত্রজীবনে তাঁদের অনেকে ইসলামি ছাত্রসংঘ করতেন। ইসলামি ছাত্রসংঘ ছিল জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন, একাত্তরে তারা রাজাকার বাহিনী, বদর বাহিনী হয়ে এখন কর্মকাণ্ড করেছিল যে তার কোনো তুলনা নেই। মানুষের ঘৃণা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই সম্ভবত এ সংগঠনটি তুলে দিয়ে নতুন নামে তাদের ছাত্র সংগঠন করা হয়েছিল। গত পাঁচ বছর তাদের রাজত্বের কথা কে না জানত—তাদের দুঃসাহস এমন বেড়েছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপককে খুন করে তারা পুলিশকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বুকে থাবা দিয়ে বলত, আসো দেখি, কে আমাদের ধরবে? কাজেই এই ভাইস চ্যান্সেলরদের একটা বড় দায়িত্ব ছিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সব রকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখা—যাঁরা চোখ-কান খোলা রেখেছেন, তাঁরা সবাই এটা জানেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পয়লা বৈশাখে একটা মেলার মতো আয়োজন করা হয়। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী নয়, শহর থেকেও লোকজন এই মেলা দেখতে আসে। জোট সরকারের ভাইস চ্যান্সেলর এসে এই মেলার কথা শুনে মেজাজ গরম করে ফেললেন, তিনি তা করতে দেবেন না। প্রতিবছরই হচ্ছে, এখন হঠাৎ করে বন্ধও করা যায় না, তাই যেটা করলেন সেটা হচ্ছে অসহযোগিতা। অনেক লোকজন আসে, তাই সব সময়ই কিছু পুলিশকে রাখা হয়, পুলিশকে আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটা চিঠি দিতে হয়—বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছুতেই সেই চিঠি দিতে রাজি হলো না! তাদের সাফ জবাব, তোমাদের যা ইচ্ছা হয় করো, কোনো অঘটন যদি ঘটে তার পুরো দায়দায়িত্ব তোমাদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর কোনো সাহায্য করবে না। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি তাই পরিচিত শিক্ষকদের বলে দিয়েছিলাম তাঁরা যেন ক্যাম্পাসে থাকেন। পুলিশের দায়িত্ব শিক্ষকেরা করতে পারবেন না; কিন্তু তবুও তো তাঁরাই শেষ ভরসা। সকাল বেলা থেকে মেলা শুরু হয়েছে, লোকজন যাচ্ছে আসছে, সারা দিন কেটে সন্ধ্যা নেমে এল। আমরা কয়েকজন শিক্ষক বারান্দায় চুপচাপ বসে দেখছি, দোয়া করছি কিছু যেন না ঘটে! রাত হয়ে যাওয়ার পর যখন ক্যাম্পাস ফাঁকা হয়ে এসেছে, একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমরা বাসায় ফিরে গেছি!

আমাদের ক্যাম্পাসে পয়লা বৈশাখ ছাড়াও বাইরের মানুষজন প্রায় নিয়মিত আসে। খোলামেলা একটা বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে ভালো লাগে, সেটা

একটা কারণ। তবে মূল কারণ হচ্ছে আমাদের শহীদ মিনার। প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমান নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সত্যিকারের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি দায়িত্ব নিয়ে প্রথমেই বললেন, আমাদের দুটি জিনিস তৈরি করতে হবে। একটা হচ্ছে শহীদ মিনার, আর একটা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ড থেকে টাকা বের করা হলো এবং সবাই মিলে এ দুটি তৈরি করার পরিকল্পনা করা হলো। যাঁরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছেন, সবাই দেখেছেন সুনামগঞ্জ সড়ক থেকে এক কিলোমিটারের গাছে ঢাকা একটা রাস্তা দিয়ে মূল ক্যাম্পাসে আসতে হয়, সেটা শুরু হয় একটা বিশাল গোল চত্বর দিয়ে। এই গোল চত্বরটিতে তৈরি হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ কিংবা ভাস্কর্য। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছনে রয়েছে টিলা, সেখানে কোনো একটা টিলার ওপর তৈরি হবে শহীদ মিনার। প্রথমে হাত দেওয়া হলো শহীদ মিনারের কাজে। ডিজাইন পাস করিয়ে কাজ শুরু করে দেওয়া হলো। স্মৃতিসৌধের ডিজাইনের ব্যাপারে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো—আমি ছুটে গেলাম নিতুন কুণ্ডুর কাছে। তিনি তখন অসম্ভব ব্যস্ত; কিন্তু তারপরেও রাজি হলেন, তবে তাঁকে একটু সময় দিতে হবে। দেখতে দেখতে শহীদ মিনারের কাজ শেষ হয়ে গেল। প্রায় একশ সিঁড়ি দিয়ে একটা টিলার ওপর উঠতে হয়। গাছে ঢাকা বিশাল চত্বর, তার শেষ মাথায় ছোটখাটো কিন্তু অপূর্ব একটি শহীদ মিনার। কেউ যদি আমাদের ক্যাম্পাসে যায়, তাহলে দেখবে বিকেল হলেই মানুষজন সেজেগুজে ছোট বাচ্চার হাত ধরে আমাদের ক্যাম্পাসে বেড়াতে এসেছে। প্রায় একশ সিঁড়ি ভেঙে সেই শহীদ মিনারটি দেখতে যাচ্ছে। এটি যখন তৈরি করা হয়, পরিকল্পনা করা হয়, তখন প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমানের সঙ্গে আমরা ছিলাম বলে গর্বে আমাদের বুক ফুলে যায়।

নিতুন কুণ্ডুর কাছ থেকে ডিজাইনটি পেতে দেরি হচ্ছিল, প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমান তখন একটু অধৈর্য হয়ে উঠলেন। বললেন, "দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি থাকতে থাকতে এটা শেষ করে দিতে চাই। আমি চলে গেলে কারা ক্ষমতায় আসে, কী হয় কিছু বলা যায় না!" আমি বললাম, "যে-ই ক্ষমতায় আসুক, সমস্যা কী? টাকা আলাদা করে রাখা আছে, সবকিছু পাস করে রাখা আছে, শুধু কাজ শেষ করা!" প্রফেসর মো. হাবীবুর রহমান তবু মাথা নাড়তেন।

আমরা তখন অন্য কয়েকটা ডিজাইন নিয়ে বসেছি এবং তার মধ্যে একটাকে বেছে নিয়ে কাজ শুরু করেছি। ঠিক এ রকম সময় দেশে

সরকারের পরিবর্তন হলো। তারপরের ইতিহাস তো সবাই জানে! জোট সরকারের ভাইস চ্যান্সেলর তাঁর রাজাকার বাহিনী নিয়ে যেভাবে এই স্মৃতিসৌধটিকে গলাটিপে হত্যা করলেন, তার কোনো তুলনা নেই! আমি একবারও চিন্তা করিনি যে মানুষ বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের বাতাস বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়, সেই মানুষ মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করে কেমন করে? মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে একটা স্মৃতিসৌধের কাজ কেমন করে বন্ধ করে দেয়?

মার্চ মাস এসেছে, আমাদের স্মৃতিতে অসংখ্য ঘটনার কথা ভেসে ভেসে আসছে। কয়দিন থেকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই গলাটিপে হত্যা স্মৃতিসৌধটির কথা মনে পড়ছে। নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পর আমার অনেকবার মনে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এই স্মৃতিসৌধটির কথা মনে করিয়ে দিই; কিন্তু তারপর থেমে গিয়েছিল। সরকার পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে একটি মানুষের তো পরিবর্তন হয়নি। যাঁরা আমাদের স্মৃতিসৌধটিকে গলাটিপে হত্যা করেছিলেন, তাঁরাই তো এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্তাকর্তা, বিধাতা! ভেতরে তো কোনো পরিবর্তন হয়নি, ছাত্রছাত্রীরা কিছু করতে চাইলে তাঁরাই এখন জরুরি অবস্থার হুমকি দেন, এর চেয়ে বড় রসিকতা আর কী হতে পারে?

৩

আমি বিশ্বাস করি একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে আমাদের স্বপ্নের সেই বিশাল স্মৃতিসৌধটি তৈরি হবে। শুধু সিলেট নয়, দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে মানুষজন এই স্মৃতিসৌধটি দেখতে আসবে। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীনতা দিবসে এই স্মৃতিসৌধটির সামনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোর কথা স্মরণ করবে। আমি বিশ্বাস করি, সৃষ্টিকর্তার এই দেশটির জন্য একধরনের মায়া আছে, তা না হলে যখন দেশটাকে উল্টোদিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য সব পরিকল্পনা করে ফেলা হয়েছিল, তখন কেমন করে আবার সবকিছু পাল্টে গেল? যাঁদের এখন আমাদের মাথায় ডাণ্ডা ঘোরানোর কথা, তাঁরা কেন জেলখানায় বসে দেয়ালে মাথা ঠুকছেন?

কেউ অস্বীকার করবে না তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করছে, তারা যদি ঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গভীর ভালোবাসা নিয়ে এ সরকারের ভূমিকাটুকু স্মরণ করবে। কিন্তু যদি কিছু গোলমাল হয়ে যায়? সাধারণ মানুষের ভেতর

একধরনের অস্বস্তি রয়েছে যে এ সরকার আমেরিকার স্নেহধন্য সরকার। তাই অনেকে মনে করে, হয়তো দেশের স্বার্থ থেকেও বড় করে দেখা হবে আমেরিকার স্বার্থ। তাদের কাজকর্মে যদি সেটা সত্যি ফুটে উঠতে থাকে, তেল, গ্যাস, কয়লা, বন্দর, ব্যাংক, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়—এ সবের নীতি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের নীতির মতো মনে হতে থাকে কিংবা র‍্যাংগস বিল্ডিং অক্ষত রেখে শুধু যদি দরিদ্র মানুষের চায়ের দোকান ভাঙা হয়, দরিদ্র হকারের সন্তানেরা যদি অভুক্ত থাকে কিংবা সারের অভাবে চাষিরা যদি ধান বুনতে না পারেন, তাহলে কী হবে? এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি সাধারণ মানুষের আস্থা হারিয়ে ফেলে, তাহলে কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটবে। এ মুহূর্তে জেলখানায় আটক সব দুর্বৃত্ত রাতারাতি নির্যাতিত জননেতায় পাল্টে যাবেন! এই "নির্যাতিত" জননেতারা আবার যদি রাজনীতিতে ফিরে আসেন, তখন এ দেশের কী অবস্থা হবে? কাজেই এ দেশের ভবিষ্যতের জন্য এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে জনগণের প্রিয় একটি সরকার হিসেবে থাকতে হবে—যেভাবেই হোক! আমি আশা করছি, তারা নিজেরাই এ ব্যাপারটি জানেন।

৪

আমি জানি না ব্যাপারটা সবাই লক্ষ্য করেছে কি না—আমাদের দেশে প্রতিবছর একটা চমৎকার ব্যাপার ঘটে। সেটা শুরু হয় ডিসেম্বরে। ডিসেম্বর হচ্ছে আমাদের বিজয়ের মাস। তাই সেই এক তারিখ থেকে আমাদের বিজয় উৎসব শুরু হয়ে যায়—রাজাকার টাইপের সব মানুষকে তখন খুব বিরসমুখে গর্তে ঢুকে যেতে হয়। বর্ষা শুরু হওয়ার আগে তারা গর্ত থেকে বের হতে পারে না। আমাদের বিজয় উৎসব ডিসেম্বরে শেষ করা যায় না, অবধারিতভাবে কিছু জানুয়ারিতে ঢুকে যায়। এর পরের মাস ফেব্রুয়ারি, আমাদের ভাষার মাস, তার প্রস্তুতিও জানুয়ারি থেকে নিতে হয়। যখন ফেব্রুয়ারি আসে, আবার আমরা একেবারে প্রথম দিন থেকে ভাষার জন্য হইচই শুরু করে দিই! একুশে ফেব্রুয়ারিতে কী ঘটে সেটা তো আর কাউকে বলে দিতে হবে না। ফেব্রুয়ারি শেষ হতেই আসে মার্চ, আমাদের অগ্নিঝরা মাস, সাতই মার্চের মাস, বঙ্গবন্ধুর মাস। যে যতই চেষ্টা করুক বঙ্গবন্ধুকে ঠেলে সরিয়ে রেখে কেউ এ দেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে পারবে না। পুরো মার্চে আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা স্মরণ করি, বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করি! মার্চ শেষ হতেই

আমরা হঠাৎ করে বাংলা ক্যালেন্ডারটা খুলে ফেলি। কারণ আসছে পয়লা বৈশাখ! এপ্রিলের মাঝামাঝি পয়লা বৈশাখের জন্য প্রস্তুতি, বাংলা নববর্ষের সেই উচ্ছ্বাস—তার কি কোনো তুলনা আছে? রাজাকার টাইপ খতিবেরা কত ফতোয়া দিয়েছেন, কেউ কী সেগুলো কান দিয়ে শুনেছে? পয়লা বৈশাখের পর আকাশে দেখা দেয় কালো মেঘের ঘনঘটা; বর্ষাকালের আগমনী বার্তা। সৃষ্টিকর্তা যেন খুব ভেবেচিন্তে ঠিক করেছেন দুঃখী এ দেশের মানুষগুলো যেন ঠিক করে তাদের উৎসবগুলো পালন করতে পারে। সেজন্য সেগুলো শুরু হয় বছরের সবচেয়ে সুন্দর সময়ে, যখন ঝড়-বৃষ্টি নেই, বন্যা নেই, অসহনীয় গরম নেই—তা না হলে এত সুন্দর করে হিসাব মিলে যায় কেমন করে?

৫

এটি মার্চ মাস। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মাস। আমি নিশ্চিত, একদিন বাংলাদেশ মাথা তুলে দাঁড়াবে। বাংলাদেশের কিছু তরুণ একদিন বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার হবে। একজন, দুইজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার ছিনিয়ে আনবেন, ক্ষুদে একজন গণিতবিদ ফিল্ড মেডেল পাবে। কোনো একটি ভাবুক কিশোর বা কিশোরী একদিন কালজয়ী লেখক হবে। দূরন্ত একটি শিশু হয়তো হবে বাংলাদেশের প্রথম মহাকাশচারী। কিন্তু কেউ কি জানে, যত চেষ্টাই করুক, কেউ কিন্তু কোনো দিন আর মুক্তিযোদ্ধা হতে পারবে না? দেশের জন্য ভালোবাসায় আত্মোৎসর্গ করার সেই সুযোগটি এসেছিল একাত্তরে এবং শুধুই একাত্তরে! মুক্তিযোদ্ধারা এসেছেন একবার এবং শুধুই একবার।

বাংলাদেশের সবাই কি তাঁর পরিচিত মুক্তিযোদ্ধার হাত স্পর্শ করে বলেছেন, "একাত্তরের যুদ্ধ করে আমাদের জন্য একটা স্বাধীন দেশ এনেছেন, সেজন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর কিছু হয়তো দিতে পারব না, ভালোবাসাটুকু দিই?"

আমরা কি আমাদের এই ভালোবাসাটুকু দিয়েছি তাঁদের?

প্রথম আলো
২২.০৩.২০০৭

সুস্থ পৃথিবী অসুস্থ মানুষ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া টেক নামে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র গুলি করে ত্রিশজনকে হত্যা করে নিজে আত্মহত্যা করেছে। যারা পৃথিবীর খোঁজ-খবর রাখেন তারা খবরটা শুনে ব্যথিত হয়েছেন কিন্তু অবাক হন নি, কারণ এটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা নিয়মিত ঘটনা। কিছুদিন পরে পরেই এরকম একটা ঘটনা ঘটে কোনো একজন বিক্ষুব্ধ মানুষ বা ছাত্র একটা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে কোনো একটা স্কুলে গিয়ে একসাথে অনেককে মেরে ফেলে।

যে মানুষটি এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় নিঃসন্দেহে সে মানসিকভাবে অসুস্থ। তার গায়ের চামড়ার রং কী, তার ধর্ম বা ভাষা কী, সে কোন দেশ থেকে এসেছে সেগুলো আসলে মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। পৃথিবীর সবদেশে সব সময়েই এরকম হতভাগ্য মানুষ রয়েছে। এই ছাত্রটি জন্মসূত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার, বয়স তেইশ, স্বচ্ছল পরিবার, বড় বোন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি থেকে লেখাপড়া শেষ করে বড় হয়েছে। নিজে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র কিন্তু মানসিকভাবে কখনই স্বাভাবিক নয়। তার শিক্ষক বলেছেন প্রথম দিন ক্লাশে সবাই নিজের নাম পরিচয় দিয়েছে—সে দেয় নি। সবাই কাগজে নিজের নাম লিখে দিয়েছে সে লিখেছে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন। আসলেই সে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন—কিন্তু সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হচ্ছে সে তিরিশজনকে মেরে ফেলতে পেরেছে এবং সেটা সম্ভব হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সংক্রান্ত আইনের জন্যে। অনেক মানুষই নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে খেপে উঠে, জগৎসংসারের ওপর প্রচণ্ড ক্রোধে সবকিছু ধ্বংস করে দিতে ইচ্ছে করে। পৃথিবীর সব দেশে সেই মানুষগুলো আশেপাশের কয়েকজনকে ধরে কিল ঘুষি মারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তারা দোকান থেকে একে ফরটি সেভেন কিনে এনে কয়েক ডজন মানুষকে গুলী করে মারতে পারে। সেখানে যে কেউ যখন খুশি অস্ত্র কিনতে পারে। আমি যখন প্রথমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম তখন এই বিষয়টা আমাকে সবচেয়ে অবাক করতো—একজন মানুষ দোকান থেকে যেভাবে টুথপেস্ট কিনতে পারে ঠিক সেভাবে একটা রিভলবার কিনে ফেলতে পারে!

সে দেশের সংবেদনশীল মানুষ, বিশেষ করে মায়েরা এভাবে অস্ত্র বেচা কেনা বন্ধ করার জন্যে অনেক দিন থেকে আন্দোলন করে আসছে, কোনো লাভ হয় নি, কারণ সেই দেশের রাজনৈতিক দল থেকেও বেশি শক্তিশালী সংগঠন হচ্ছে ন্যাশনাল রাইফেল এসোসিয়েশন, যারা বিশ্বাস করে সেই দেশের সকল মানুষের অস্ত্র কেনা এবং রাখার অধিকার আছে! যে মানুষটি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে চায় তাকে অবধারিতভাবে ন্যাশনাল রাইফেল এসোসিয়েশনের অনুগ্রহ পেতে হয়, তাই তারা নিজেরাও এই সংগঠনটির মেম্বার হয়ে থাকেন। বর্তমান যে প্রেসিডেন্ট বুশ তার বাবার নামও বুশ, তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সেই জর্জ বুশের নির্বাচনী প্রচারণার সময় আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা একটা বিতর্কে অংশ নিচ্ছেন, তখন তাদেরকে ন্যাশনাল রাইফেল এসোসিয়েশন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। একজন সজোরে ঘোষণা দিলেন যে তিনি তার সদস্য। জর্জ বুশ কোনো কথা না বলে পকেট থেকে একটা রিভলবার বের করে টেবিলের উপর রাখলেন, নাটকীয়ভাবে তিনি বুঝিয়ে দিলেন অস্ত্রের সাথে তার গভীর ভালবাসা!

এটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা—কাজেই এই দেশে এরকম ঘটনা যে ঘটবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আমার চারপাশে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ঘুরে বেড়ায়—তাদের ভেতর থেকে ত্রিশজনকে কেউ মেরে ফেলবে বিষয়টা আমি কল্পনাও করতে পারি না—ভার্জিনিয়া টেকের শিক্ষকেরা কেমন অনুভব করছেন আমি জানি। বছর খানেক আগে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয় কর্মকাণ্ডের সুযোগে পুলিশ গুলি করে শামীম নামে একটা ছাত্রকে মেরে ফেলেছিল সেই কষ্টটা আমি ভুলতে পারি না। (বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অসংখ্যবার বলা হয়েছে তারা গা করেন না) ভার্জিনিয়া টেকের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীরা অভিভাবকেরা কীভাবে বিষয়টা নিচ্ছেন আমি ভেবে পাই না।

শুধু আশা করে থাকি পৃথিবীর মানুষ সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবেদনশীল মানুষ, তাদের মাতা ভগ্নীরা মিলে সেই দেশের ন্যাশনাল রাইফেল এসোসিয়েশনের মতো সংগঠনকে পরাস্ত করে অস্ত্রকে সাধারণ মানুষের ধরা ছোয়ার বাইরে নিয়ে যাবেন। বাকি পৃথিবীর সাথে সামিল হয়ে তারা সুন্দর সুস্থ একটা পৃথিবী গড়ে তুলবেন।

প্রথম আলো
এপ্রিল ২০০৭

বৈশাখের হাহাকার

একটা গল্প বলা যাক, বানানো গল্প নয়, সত্যি গল্প। যে মানুষটিকে নিয়ে গল্প, তিনি অত্যন্ত সুদর্শন। তাঁর বয়স চল্লিশের কোঠায়, পাঁচজন ছেলেমেয়ে আর প্রিয়তমা স্ত্রী নিয়ে তাঁর ভরভরন্ত সংসার। যে মাটিতে জন্ম হয়েছে, সে মাটির জন্য তাঁর বুকভরা ভালোবাসা। শুধু মাটি নয়, সেই মাটির মানুষগুলোকেও তিনি বুক আগলে রক্ষা করেন। মানুষটি স্বাধীনচেতা, অসম্ভব তেজস্বী, চারপাশের মানুষগুলো বিপদে-আপদে সবার আগে তাঁর কাছে ছুটে আসেন।

এ মানুষটি একদিন একটা বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরে আসছেন, সঙ্গে আরও তিনজন। ভর দুপুরবেলা তাঁর পথ আটকাল ছয়জন সাদা পোশাকের পুলিশ। কিছু বোঝার আগে তাঁদের সবাইকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে ফেলল। অ্যারেস্ট করেই তারা থামল না, কোথায় জানি তারা ফোন করে দিল। দেখতে দেখতে সেখানে দুই লরি-বোঝাই উর্দি পরা সশস্ত্র মানুষ এসে হাজির। একজন নয়, দুইজন নয়, সেখানে ৪০ জন সশস্ত্র মানুষ—তারা সেই নির্ভীক মানুষ আর তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে গেল তাদের ক্যাম্পে।

সুদর্শন সেই তেজস্বী মানুষটিকে জানালার গ্রিলের সঙ্গে বাঁধা হলো। তখন ঘরের ভেতর এলেন একজন এলেন একজন মেজর, তার নাম তৌফিক এলাহী। গ্রিলে বাঁধা মানুষটির দিকে তাকিয়ে তখন তিনি তাঁর লোকজনকে আদেশ দিলেন—তাঁকে একটা উচিত শিক্ষা দিয়ে শায়েস্তা করতে।

মেজর সাহেবের আদেশ শুনে একজন নয়, দুইজন নয়, নয়জন জোয়ান গ্রিলে বাঁধা মানুষটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এক অমানুষিক হিংস্রতা নিয়ে। একসঙ্গে সবাই তাঁকে মারতে শুরু করল। সে কী মার—একজন মানুষ হয়ে অন্য একজন মানুষকে কেমন করে এভাবে মারতে পারে? সুদর্শন তেজস্বী সেই সম্মানী মানুষটি প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন কিন্তু কারও এতটুকু মায়া হলো না। মানুষটিকে তাঁরা মারতে থাকলো এবং মারতে থাকলো এবং একসময় রক্তবমি করতে করতে মানুষটি অচেতন হয়ে

গেলেন। যখন আবার তাঁর জ্ঞান ফিরে এল, তখন তাঁরা আবার তাঁকে মারতে থাকেন—একবার নয়, বারবার, অসংখ্যবার। অর্ধমৃত মানুষটিকে তখন জানালার গ্রিল থেকে খুলে উল্টো করে বাঁধা হলো, ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হলো তাঁর নাক দিয়ে, নখগুলো টেনে টেনে আলাদা করা হলো তাঁর আঙুল থেকে, হাতগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো আঘাত করে, পেরেক ঢুকিয়ে দেওয়া হলো হাতে-পায়ে। প্রচণ্ড অত্যাচারে হাতের একটা আঙুল ছিন্ন হয়ে গেল। চোখগুলো খুবলে তুলে নেওয়া হলো, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করা হলো পৈশাচিক উন্মত্ততায় (আমি জানি, আমার লেখা পেলেই অনেক ছোট ছেলেমেয়ে সেটা পড়তে শুরু করে, আমি এই নির্যাতনের আরও অনেক কিছু জানি, তবু আমি সেই অংশটুকু বর্ণনা করতে চাই না)।

সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই মানুষের ওপর মানুষের এই অত্যাচারটুকু সহ্য করতে পারলেন না। তিনি পরম ভালোবাসায় এই তেজস্বী মানুষটিকে পৃথিবীর সব নৃশংসতা থেকে মুক্ত করে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর প্রাণহীন দেহটি ঢলে পড়ল সেই মেজর আরও কিছু অফিসার এবং নাম না জানা অনেক হিংস্র মানুষের পায়ের কাছে। সেই মৃতদেহটি নিয়ে তাঁরা আনন্দের অট্টহাসি হেসেছিল কি না, সে কথাটি কেউ জানে না।

নিষ্ঠুরতাটুকু সম্পূর্ণ করার জন্য তাঁর মৃতদেহটি নিয়ে পৌঁছে দেওয়া হলো তাঁর প্রিয়জনের কাছে। তাঁর স্ত্রী আর সন্তানদের হাহাকারে নিশ্চয়ই সেই এলাকার আকাশ-বাতাস ভারী হয়েছিল। সৃষ্টিকর্তা তখন কী ঠিক করেছিলেন কে জানে?

আমি জানি, যারা লেখাটুকু এ পর্যন্ত পড়ে এসেছে, তারা সবাই ভাবছে, আমরা তো শুধু মার্চ মাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সেই ভয়ঙ্কর অমানুষিক অত্যাচারের কথা বলি, এখন তো এপ্রিল মাস শেষ হয়ে মে মাস চলে এসেছে, এখন কেন আমি সেই কথাগুলোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, যে কথাগুলো আমরা ভুলে থাকতে চাই? তার কারণ ঘটনাটি আসলে মার্চ মাসের। তবে সেটি ১৯৭১-এর মার্চ নয়, ২০০৭ সালের মার্চ মাস। যে সমস্ত মানুষ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য নয়, তারা আমাদের সেনাবাহিনীর সাহায্যপুষ্ট যৌথ বাহিনীর সদস্য। এই মেজর একজন বাঙালি মেজর, যে তেজস্বী মানুষটিকে যৌথ বাহিনী হত্যা করেছে, তিনি মধুপুরের একজন আদিবাসী নেতা, তাঁর নাম চলেশ রিছিল। আমি জানি, আমরা কেউ এটা বিশ্বাস করতে চাই না, কিন্তু এটি সত্য।

ঠিক কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে সেটি সঠিকভাবে না জানলেও চলেশ রিছিলের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মুখ থেকে শোনা ঘটনায় সেটা অনুমান করা যায়। চলেশ রিছিলের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহটি দেখেও তাঁর ওপর অত্যাচারের প্রক্রিয়াটি অনুমান করা যায়। কখনো সাক্ষী প্রমাণ রেখে মানুষকে হত্যা করা হয় না, যারা ব্যাপারটি ঘটিয়েছে তারা নিজে থেকে সেটা প্রকাশ না করলে আমরা হয়তো সত্যিকার ঘটনাটা কখনই জানতে পারব না, কিন্তু তার খুব কাছাকাছি অনুমান করতে পারব। চতুর্দশ সার্ক সম্মেলনে প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে এশিয়ান সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পাঠিয়েছে। সেই বর্ণনাটুকু যারা পড়েছে, শুধু তারাই বলতে পারবে মানুষের নৃশংসতা কোন পর্যায়ে যেতে পারে।

২

প্রশ্ন হলো, কেন মেজর একজন বাঙালি তাঁর সঙ্গের কিছু মানুষকে নিয়ে এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় চলেশ রিছিলকে হত্যা করেছেন? সেই কাহিনীটাও কি অবিশ্বাস্য নয়?

এটি শুরু হয়েছে ২০০৩ সালে, যখন জোট সরকার ঘোষণা করেছিল, মধুপুরে তারা একটা ইকোপার্ক করবে। চলেশ রিছিল থাকেন মধুপুরে। সেখানে থাকেন তাঁর মতো আরও অনেক গারো আদিবাসী। তাঁদের কারও সঙ্গে একটি কথা না বলে মধুপুরের তিন হাজার একর অরণ্য ঘিরে একটা দেয়াল তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হলো। এই ইকোপার্কের কারণে প্রায় পঁচিশ হাজার আদিবাসী উৎখাত হয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা দেখা দিল। হাজার বছর ধরে যে বাপ-দাদার ভিটেতে আদিবাসীরা আছেন, তাঁরা সবাই মিলে ২০০৪ সারের ৩ জানুয়ারি একটা বিশাল প্রতিবাদ মিছিল গড়ে তুললেন। শান্তিপূর্ণ সেই মিছিলে পুলিশ গুলি করল নির্বিচারে, অনেক মানুষ আহত হলো, মারা গেল পিরেন স্নান।

প্রবল প্রতিবাদের মুখে বন বিভাগ তখন ইকোপার্ক স্থাপনের কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলো। কিন্তু তারা থেমে গেল না, স্থানীয় আদিবাসীদের বিরুদ্ধে তখন তারা মামলা করতে শুরু করল, মিথ্যা মামলা—একটি নয়, দুটি নয়, শত শত। প্রায় সব মামলাতেই আসামী হিসেবে নাম রয়েছে চলেশ রিছিলের। তাঁর অপরাধ, তিনি ইকোপার্কের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে

তুলেছেন। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে; সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয় আদিবাসীদের শায়েস্তা করার জন্য শুধু মধুপুর এলাকাতেই মামলা করা হয়েছে পাঁচ হাজার!

এ দেশে যাঁরা ইকোপার্কের কথা বলেন, তাঁরা কিন্তু ইকোলজি শব্দটার সঙ্গে পরিচিত নন। ইকোপার্কের নাম দিয়ে তাঁরা আসলে প্রকৃতি, তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে ছিন্নভিন্ন করে সেখানে কিছু পিকনিক স্পট তৈরি করতে চান। সেখানে শহর থেকে মাইক বাজাতে বাজাতে মানুষজন এসে হিন্দি গান শুনতে শুনতে বিরিয়ানির প্যাকেট খাবে, তারপর পুরো এলাকাটাকে জঞ্জালে পরিপূর্ণ করে চলে যাবে। তা না হলে মধুপুরের মতো এলাকায় ইকোপার্কের নাম দিয়ে কেউ দশটা পিকনিক স্পট তৈরি করতে চায়? ছয়টা ব্যারাক তৈরি করতে চায়?

চলেশ রিছিলের নেতৃত্বে স্থানীয় আদিবাসীদের প্রবল প্রতিবাদের মুখে বন বিভাগ ইকোপার্কের কাজ স্থগিত করলেও হাল ছেড়ে দিল না, তারা সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকল। সুযোগ এল ১১ জানুয়ারি, যখন দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলো। বন বিভাগ তখন জরুরি অবস্থার ঢাল হাতে নিয়ে আবার সেই রুচিহীন কুৎসিত ইকোপার্ক তৈরি করার কাজে লেগে গেল। আদিবাসীরা আবার প্রতিবাদ করতে নেমে এলো, আবার নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন চলেশ রিছিল। ইকোপার্কের কাজ বন্ধ হলো সত্যি কিন্তু চলেশ রিছিল জানতেও পারলেন না—তিনি তাঁর মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করে দিয়ে এলেন।

ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখে যৌথ বাহিনীর একজন ওয়ারেন্ট অফিসার একজন সেকেন্ড লেফটেনেন্ট, সার্জেন্ট এবং আরও কিছু লোকজন নিয়ে চলেশ রিছিলের গ্রামে হানা দিল। তাঁকে না পেয়ে যৌথ বাহিনী অন্যদের সঙ্গে তাঁর স্কুলপড়ুয়া ছেলেদের ধরে নিয়ে গেল ক্যাম্পে। তারপর সেই কিশোর-তরুণদের ওপর সে কী অত্যাচার! মানুষ হয়ে কেমন করে অন্য মানুষের ওপর এমনভাবে অত্যাচার করে?

যৌথ বাহিনী হাল ছেড়ে দিল না, তারা চোখ-কান খোলা রাখল। শেষ পর্যন্ত তারা চলেশ রিছিলের খোঁজ পেল; ১৮মার্চ ২০০৭, একটা বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরে আসছিলেন—তাঁকে ধরে ফেলল পথের মধ্যে। এর পরের ইতিহাস সবার জানা। নিজের মাটি, নিজের মানুষকে ভালোবাসার জন্য তাঁকে প্রাণ দিতে হলো এ দেশেরই সেনা বাহিনীর হাতে। হ্যাঁ, এই দেশের সেনাবাহিনীর হাতে।

৩

চলেশ রিছিলের স্ত্রী সন্ধ্যা রানী সিমসাংয়ের বয়স মাত্র আটাশ। তিনি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে পুলিশের কাছে মামলা করতে গিয়েছিলেন। এপ্রিলের ২ তারিখ পর্যন্ত পুলিশ সেই মামলা নেয়নি—আমার ধারণা, পুলিশ মামলা নেবে না। বাংলা ভাইয়েরা যখন মানুষকে খুন করে লাশ উল্টো করে গাছের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখত, তখনো পুলিশ মামলা নিত না। পুলিশের অনেক রকম বদনাম আছে—কিন্তু তারা নির্বোধ এই বদনাম নেই; তারা খুব ভালো করে জানে, কখন মামলা নিতে হয় আর কখন নিতে হয় না। কাগজে-কলমে এখন ক্ষমতা কার হাতে আর আসলে ক্ষমতা কার হাতে পুলিশ সম্ভবত সেটা আমাদের চেয়ে ভালো করে জানে। তাই একেবারে দিনদুপুরে একজন মানুষকে খুন করে ফেললেও পুলিশ এখন কোনো মামলা নেবে না।

অন্যদের কথা জানি না, কিন্তু আমি নিজে একটা খুব বড় ধাক্কা খেয়েছি। প্রায় প্রতিদিনই এই সরকারের কেউ না কেউ অন্যায়, অবিচার আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলছেন। এ হত্যাকাণ্ডটি কি অন্যায় নয়? অবিচার নয়? তাহলে চলেশ রিছিলের স্ত্রী কেন এর বিচার চাইতে পারবেন না? চাঁদাবাজি করার জন্য যদি তারেক রহমানকে জেলে ঢোকানো সম্ভব হয়, তাহলে মানুষ হত্যা করার জন্য কেন যৌথ বাহিনীর কিছু অফিসারকে জেলে ঢোকানো যাবে না? চাঁদাবাজি থেকে কি মানুষকে হত্যা করা আরও অনেক বড় অপরাধ নয়?

জোট সরকারের আমলে একটা সময় ছিল যখন দেশে কেউ কোথাও বিচার চাইতে পারত না। যারা অন্যায়-অবিচার করত, তারাই আবার দেশ চালাত। বিচারটা কার কাছে চাইবে? আমরা তখন খবরের কাগজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, সেটাই ছিল আমাদের জজ কোর্ট, আমাদের হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট। জয়নাল হাজারী যখন সাংবাদিক টিপু সুলতানের হাত-পা ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়েছিল, তখন তাঁর বিচার করেছিল সংবাদপত্র! আহত সেই সাংবাদিকের ওপর নৃশংস অত্যাচারের কথা খবরের কাগজে বড় বড় করে দিনের পর দিন ছাপা হয়েছিল, সারা দেশের মানুষ তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই অবিচার, সেই নৃশংসতা নিয়ে দেশের মানুষ খবরের কাগজে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বাংলা ভাইয়ের দলবল যখন একেবারে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় মানুষের ওপর নৃশংস অত্যাচার শুরু করেছিল, তখন জোট সরকারের যুদ্ধাপরাধী মন্ত্রী

মতিউর রহমান নিজামী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সে কথা বিশ্বাস করেননি। বলেছেন—এগুলো মিথ্যে কথা, সাংবাদিকদের বানানো গল্প। সাংবাদিকেরা এক মুহূর্তের জন্য থামেননি, দিনের পর দিন সংবাদপত্রে লিখে গেছেন। তা না হলে এ দেশে এই জঙ্গিদের বিরুদ্ধে এ রকম ঘৃণার কেমন করে জন্ম হলো? জঙ্গি নেতাদের ফাঁসি হওয়ার পর সাধারণ মানুষ কত বড় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে সবাই কি লক্ষ করেছে?

অথচ চলেশ রিছিলের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর কোথাও কোনো লেখালেখি নেই। কবি নির্মলেন্দু গুণের একটা দুঃখী কবিতা দেখেছি। *ডেইলি স্টার*-এ বিদেশের কিন্তু তরুণ-তরুণী লিখেছে কিন্তু বাংলাদেশের মূলধারার সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীরা কেউ কিছু লিখছেন না কেন? এত বড় একটা অবিচার দেশের মানুষ মুখ বুজে সহ্য করবে?

৪

এই সরকার জানে কি জানি না, শুরুতে তারা কিন্তু ছিল খুব জনপ্রিয় সরকার। তারা জনপ্রিয় ছিল তার কারণ সাধারণ মানুষ যা চায় তারা ঠিক সেই কাজগুলো করছিল, দুর্নীতিবাজদের ধরছে, শাস্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করছে। আমি ঠিক জানি না—সরকারটি যেহেতু নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসেনি, তাই দেশের মানুষ তাদের সম্পর্কে কী ভাবছে, তারা সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় কি না। যদি মাথা ঘামায়, তাহলে কিন্তু খুব ঠাণ্ডা মাথায় তাদের একটা জিনিস ভাবতে হবে—একজন মেজর তৌফিক এলাহীকে দিয়ে তারা তাদের সব অর্জনকে ধূলিসাৎ করে দেবে কি না। দেশের খবরের কাগজ চলেশ রিছিলকে নিয়ে রহস্যময়ভাবে নীরব থাকতে পারে, দেশের বাইরের মানুষজন কিন্তু নীরব নয়। চলেশ রিছিলের সেই রক্তাক্ত দেহের ছবি কিন্তু সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সরকার নিজের অজান্তেই কিন্তু দেশের বাইরে একটি স্বৈরাচারী নির্যাতনকারী সরকার রূপে চিত্রিত হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান ড. ফখরুদ্দীন আহমদ ও সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ দেশ নিয়ে, দেশের মানুষ নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, থাকলে তাঁদের আমি অনুরোধ করতাম, চলেশ রিছিলের স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতে—"এই দেশ নিয়ে আমাদের অনেক স্বপ্ন—আপনি কি সেই স্বপ্নের কথা বিশ্বাস করেন?"

আমি জানি, চলেশ রিছিলের স্ত্রী সেই প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে ঘৃণায় তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেবেন। আর কেউ জানুক আর না-ই জানুক, চলেশ রিছিলের স্ত্রী সন্ধ্যা রানী সিমসাং জানেন, ২০০৭ সালের বাংলাদেশে তাঁর কোনো স্বপ্ন নেই। যে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় তাঁর সন্তানদের জনককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়, সেই বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার চাওয়ার জন্যও এই বাংলাদেশে তাঁর কোনো জায়গা নেই।

৫

আমি জানি না, আমার এ লেখাটি *প্রথম আলোয়* ছাপা হবে কিনা। যদিও মুখে বলা হচ্ছে, সংবাদপত্রে কোনো বাধা-নিষেধ নেই, কিন্তু এখন জরুরি অবস্থা, কী ছাপা হতে পারে, কী ছাপা হতে পারে না—কে জানে, সেটা নিয়ে আসলে হয়তো বিধিনিষেধ আছে। যে মানুষগুলো এ হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছে তাদের নাম সবাই জানে, কিন্তু তা উচ্চারণ করতে সাহস পায় না।

যদি এ লেখাটি ছাপা না হয়, তাহলে আমার হাতে লেখা এই কাগজগুলো নিয়ে আমাকে সেই মধুপুরের এক গ্রামে গিয়ে চলেশ রিছিলের স্ত্রী সন্ধ্যা রানী সিমসাংকে খুঁজে বের করতে হবে। পাঁচ সন্তানের সেই জননীর সামনে আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না, মাথা নিচু করে বলতে হবে, "আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। বিশ্বাস করুন, আমি চেষ্টা করেছিলাম।" আমি জানি না, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন কি না।

চলেশ রিছিলের স্ত্রী সন্ধ্যা রানী সিমসাংয়ের পাঁচ সন্তানের সবচেয়ে বড়জনের বয়স ১৫ সবচেয়ে ছোটজনের বয়স মাত্র পাঁচ। ফিরে আসার সময় সবচেয়ে ছোট শিশুটির মাথায় হাত রেখে আমার খুব ফিসফিস করে বলার ইচ্ছে করবে, "তুমি মন খারাপ কোরো না। দেখো, তুমি যখন বড় হবে তখন এই বাংলাদেশটি হবে তোমার বাবা যে রকম বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছিলেন ঠিক সেই রকম।"

ছোট শিশুটি আমার কথাটিতে কোনো গুরুত্ব দেবে কি না আমি জানি না, কিন্তু আমার এ কথাটি খুব বিশ্বাস করার ইচ্ছা করে।

বৈশাখ মাস দিয়ে একটা নতুন বছর শুরু হয়েছে। এই নতুন বছরকে ঘিরে বাঙালি, পাহাড়ি, আদিবাসী সবার মনে কত স্বপ্ন—কত আনন্দ! সবাই কি জানে, এই স্বপ্নের ঠিক মাঝখানে কারও কারও বুকের মধ্যে কী গভীর শূন্যতা, কী গভীর হাহাকার?

আমরা যদি এই হাহাকার শুনে ছুটে না যাই, কে যাবে?

৬

খবরের কাগজে দেখেছি এই হত্যাকাণ্ডে জন্য, বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য এক সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে। সুষ্ঠু তদন্ত করে অপরাধীর শাস্তি দিয়ে আমরা কী আমাদের এই গ্লানি থেকে মুক্তি দিতে পারব? বাংলাদেশের মাটিতে কখনো এই নিষ্ঠুরতার পুনরাবৃত্তি হবে না—সেটি নিশ্চিত করতে পারব?

প্রথম আলোতে খানিকটা পরিবর্তিত ভাবে প্রকাশিত
১০ মে ২০০৭

স্বপ্ন কি বিক্রি করা যায়?

উত্তর হচ্ছে "না"—স্বপ্ন বিক্রি করা যায় না। আমরা অবশ্য দেখতে পাচ্ছি যে নতুন একটা পৃথিবী তৈরি করা হচ্ছে যেখানে ভালো দাম পেলে নিজের মাকেও বিক্রি করে দেওয়ার নিয়ম। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফের ফর্মুলা আর বিশ্বায়নের মতো বড় বড় দুর্বোধ্য শব্দ দিয়ে সেই নিয়মগুলো পৃথিবীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবাইকে বোঝানো হয়—এখন সবকিছুই পণ্য, সবকিছুই বিক্রি করে দেওয়া যায়। এখানে শিক্ষা বিক্রি হয়, স্বাস্থ্যসেবা বিক্রি হয়। ধর্ম বিক্রি হয়, নীতি কথা বিক্রি হয়। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ দেশে স্বপ্নও বিক্রি হয়।

ভ্যালেরি এ টেইলরের একটা স্বপ্ন ছিল। তিনি এ দেশের দুস্থ-অসহায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষদের বিনামূল্যে সুস্থ করে তুলবেন, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবেন। সারা জীবনের পরিশ্রমে তিনি যখন এ স্বপ্নটাকে সত্যি করে তুলেছেন তখন কিছু বেনিয়া এসে ভ্যালেরি টেইলরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলেছেন, অনেক হয়েছে এখন তুমি যাও। আমরা এখন এ স্বপ্ন বিক্রি করব।

তারপর তাঁরা ভ্যালেরি টেইলরের স্বপ্নকে টুকরো টুকরো করে প্রতি টুকরো ১৮ হাজার ৫০০ টাকা করে বিক্রি করতে শুরু করলেন। বাংলাদেশের হতদরিদ্র দুস্থ পক্ষাঘাগ্রস্ত মানুষেরা এত দিন যে সেবাটুকু বিনা খরচে কিংবা নিজের সাধ্যের ভেতরে পেয়ে এসেছেন হঠাৎ করে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন ভর্তি হতেই তাঁদের লাগছে ১৮ হাজার ৫০০ টাকা, এখান থেকে যাওয়ার সময় তাঁদের হাতে কত সহস্র টাকার বিল ধরিয়ে দেওয়া হবে তার কোনো হিসাব নেই। খবরটা পড়ে আমার মতো মানুষেরই এত খারাপ লাগছে—যিনি তিল তিল করে এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন সেই ভ্যালেরি টেইলরের কেমন লাগছে আমি কল্পনাও করতে পারি না।

২

একটা সুন্দর গান শুনলে কিংবা একটা চমৎকার বই পড়লে যেমন বুকটা ভরে যায়, ভ্যালেরি টেইলরের জীবনের গল্পটাও সে রকম। শুনলে বুকটা

ভরে যায়। এ দেশের সঙ্গে তাঁর ভালোবাসার প্রকৃত বন্ধন শুরু হয়েছে একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর থেকে। তিনি প্রথমে এসেছিলেন ঊনসত্তরে, কিন্তু বেশি দিন থাকতে দেওয়া হয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নিজের দেশ ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে হয়েছিল, যুদ্ধের পর আবার ফিরে এসেছেন।

আমাদের মতো বয়সী মানুষেরা যারা ঠিক স্বাধীনতার পরবর্তী সময়টুকু দেখেছে শুধু তারাই জানে কী ভয়াবহ দুঃসময় ছিল সেই সময়টা। সহায়-সম্বলহীন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত একটা দেশে সবচেয়ে অসহায় ছিল সম্ভবত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা ("পঙ্গু" বলে একটা শব্দ আছে, অন্যদের জন্য ব্যবহার করলেও একজন মুক্তিযোদ্ধার আগে আমরা কখনো সে শব্দটা বসাই না, তাঁদের তো আর কিছুই দিতে পারিনি, না হয় পঙ্গু শব্দের বদলে যুদ্ধাহত শব্দটাই উপহার দিই)। ভ্যালেরি টেইলর একজন ফিজিওথেরাপিস্ট, তিনি এ দেশের যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের নিজের পায়ে দাঁড়া করানো বা অন্যান্য সহায়তা দিয়ে, পুনর্বাসনের কাজ দিয়ে তাঁর জীবনটুকু শুরু করলেন। শুধু যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা নন, ভাগ্যহত অন্য পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষদেরও সেবা দেওয়া শুরু করলেন। প্রথম জীবনটি তাঁর খুব কষ্টে গেছে, মানুষকে সেবা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থটুকুও নেই। শুনে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যি সত্যি তিনি লন্ডনে গিয়ে বাসস্টেশনে, রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন।

১৯৭৯ সালের দিকে ভ্যালেরি টেইলর ভাবলেন পঙ্গু অসহায় মানুষকে সেবা দেওয়ার এ প্রক্রিয়াটাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া দরকার। খুঁজে পেতে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের সামনে দুটো পরিত্যক্ত সিমেন্টের গুদামে ভ্যালেরি টেইলর তাঁর প্রতিষ্ঠান সিআরপি'র (পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র) যাত্রা শুরু করলেন। এর পরে প্রায় এক যুগ একটা স্থায়ী ঠিকানার খোঁজে আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ালেন, শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালে সাভারে পাঁচ একর জমি কিনে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠান নিয়ে স্থায়ী হলেন। এখন সেখানে কাজ করেন প্রায় পাঁচ শ মানুষ। এক শ শয্যার এ হাসপাতালে এখন দেশি-বিদেশি ফিজিওথেরাজিস্টদের নিয়ে গড়ে উঠেছে আধুনিক ফিজিওথেরাপি এবং অকুপেশনাল থেরাপি বিভাগ, আউটডোর চিকিৎসা, সেরিব্রাল পলসিতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত শিশুদের চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এমনকি পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষদের চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বিনোদন, মানসিকভাবে শক্তি-সাহস দিয়ে পুনর্বাসনের সব ব্যবস্থা। বর্তমানে চৌদ্দ

একর এলাকা নিয়ে বিস্তৃত এ প্রতিষ্ঠানটির বাজেট এখন বছরে দশ থেকে বারো কোটি টাকা।

জন্মসূত্রে বাংলাদেশের না হয়েও ভ্যালেরি টেইলর ছিলেন পুরোপুরি বাংলাদেশের মানুষ। তাই তিনি জানতেন, এ দেশের দুস্থ-অসহায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষগুলোর আসলে চিকিৎসার খরচ দেওয়ার সামর্থ্য নেই। প্রায় সময়েই যে মানুষটি পুরো পরিবারের জন্য জীবিকা অর্জন করছেন তিনিই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পুরো পরিবারকে পথে বসিয়েছেন, চিকিৎসার খরচ দূরে থাকুক কারও মুখে দুটো ভাত তুলে দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তাই ভ্যালেরি টেইলর এ প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের স্বপ্নের মতো গড়ে তুললেন। যার যেটুকু সামর্থ আছে সে ততটুকু চিকিৎসার খরচ দেবে, যার সামর্থ্য নেই সে একেবারেই বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাবে। ভ্যালেরি টেইলরের একক প্রচেষ্টা, তাঁর কিছু সুযোগ্য সহকর্মী এবং এ দেশের অসংখ্য ভাগ্যাহত মানুষের ভালোবাসায় ধীরে ধীরে এ প্রতিষ্ঠানটি যখন একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানে গড়ে উঠেছে, ঠিক তখন এর ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ জমে উঠতে শুরু করল!

৩

এ প্রতিষ্ঠান থেকে কীভাবে ভ্যালেরি টেইলরকে ক্ষমতাহীন করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ দেশের অনেক পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। মানুষের কুটিল ষড়যন্ত্রের কথা লিখতে ভালো লাগে না, পড়তেও ভালো লাগে না। যে বিষয়গুলো পড়লে একেবারে চমকে উঠতে হয় সেটা হচ্ছে এ রকম : দুস্থ মানুষের সেবার জন্য তৈরি করা এ প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সিইও শফি সামির বার্ষিক বেতন ছিল এ প্রতিষ্ঠানের পুরো বাজেটের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ! এ দেশের একজন অবসরপ্রাপ্ত সেক্রেটারির পেনশনের টাকা দিয়ে চমৎকারভাবে সংসার চলে যাওয়ার কথা, তারপরেও যদি টাকার প্রয়োজন হয় তাহলে খুব সহজেই যেসব প্রতিষ্ঠান টাকা তৈরি করে, সে রকম প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারতেন। এখানে মোবাইল টেলিফোন কোম্পানি আছে, বহুজাতিক কোম্পানি আছে, ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল আছে, প্রাইভেট ব্যাংক আছে—সেগুলোর যেকোনোটাতে যোগ দিয়ে অনায়াসে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করতে পারতেন। যে প্রতিষ্ঠানটি দরিদ্র মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য অল্প কিছু অর্থ দিয়ে চলছে সেই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে তার পুরো বাজেটের ত্রিশ ভাগের

এক ভাগ নিজের পকেটে নিয়ে নেওয়ার মধ্যে যে এক ধরনের চরম দীনতা আছে সেটি কি জনাব শফি সামির চোখে পড়েনি?

খবরের কাগজে দেখেছি, এ পুরো ব্যাপারটি করা হয়েছিল গোপনভাবে। ভ্যালেরি শেষ পর্যন্ত যখন সেটা জানতে পেরেছিলেন তখন তিনি খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। (দেশের মানুষও সেটা জানতে পেরে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছে, শফি সামির দুই লাখ থেকে বেশি টাকা বেতনের বিপরীতে ভ্যালেরি টেইলরের বেতন ছিল মাসে সাত হাজার টাকা!) ভ্যালেরি টেইলর প্রতিবাদ করলেন এবং একসময় এ বেতন বন্ধ হলো কিন্তু ভ্যালেরি টেইলর এ দেশের অত্যন্ত শক্তিশালী কিছু মানুষকে তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়ে গেলেন। সেখানে শফি সামির সঙ্গে সঙ্গে যাঁদের নাম উঠে এসেছে তাঁরা হচ্ছেন, অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মুহম্মদ নূরুল হক ও ভারপ্রাপ্ত সিইও আলবার্ট মোল্লা। ট্রাস্টি বোর্ডের মানুষেরা কায়দাকানুন করে তাঁর পদটি বাতিল করে দিলেন, তিনি এখন চেকে স্বাক্ষর করার ক্ষমতা পর্যন্ত রাখেন না। শুধু তা-ই নয়, এ রকম অবস্থায় যা করতে হয় তাও করতে শুরু করলেন, ভ্যালেরি টেইলরের বিরুদ্ধে অনিয়ম আর দুর্নীতির কথা ছড়িয়ে দিলেন।

যে মানুষটি নিজের দেশ ছেড়ে এসে ভিন দেশের দুঃখী মানুষকে আপন করে নিয়ে সুদীর্ঘ ২৭ বছর মমতাময়ী মায়ের মতো মানুষের সেবা করে যাচ্ছেন, যে মানুষটিকে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পদক দিয়ে এ দেশের নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করেছে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার আগে একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যে মানুষ ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে সে বহু নিচে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের মুখে থুথু দিতে পারে। কিন্তু কোনো মানুষ যদি অনেক ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে নিচে থেকে তার মুখে থুথু দেওয়া যায় না। যাঁরা সেই চেষ্টা করেছেন তাঁরা কি আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের ছুঁড়ে দেওয়া থুথু ভ্যালেরি টেইলরকে স্পর্শ করেনি? প্রকৃতির নিয়মে সেই থুথু চটাং চটাং শব্দ করে তাঁদের মুখে এসে পড়ছে!

৪

হতে পারে মমতাময়ী মায়ের মতো একজন মানুষের নিজের হাতে গড়ে তোলা একটা প্রতিষ্ঠান এত বড় হয়ে গেছে যে সেটা এখন তাঁর একার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয়। এটাও হতে পারে, একটা বড় প্রতিষ্ঠানের সব কাগজপত্র কীভাবে সামলাতে হয় সেটা ভ্যালেরি টেইলর জানেন না। এটাও

অবিশ্বাস্য নয়, কোনো দুর্বৃত্ত তাঁর সরলতার সুযোগ নিয়ে টু পাইস কামাই করে ফেলেছে। এ সমস্যাগুলোর সমাধানও খুব সহজ, ভ্যালেরি টেইলরের পাশে থেকে তাঁকে সাহায্য করা। যে কাজটি তাঁর জন্য করা কষ্ট অন্য কারও সে কাজটি করে দেওয়া। তিনি যে স্বপ্ন চোখে নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি দাঁড় করার চেষ্টা করেছেন যারা সেই স্বপ্নকে বুকে ধারণ করতে পারে না, তাদের কারও ভ্যালেরি টেইলরের ধারে-কাছে আসার কথা নয়। এটা টাকা উপার্জন করার জায়গা নয়, যাঁরা টাকা উপার্জন করতে চান তাঁদের জন্য এ দেশে এখন অনেক জায়গা আছে। যাঁরা ভ্যালেরি টেইলরের স্বপ্নকে বিশ্বাস করেন শুধু তাঁরাই তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে পারবেন, অন্য কেউ নয়।

৫

ভ্যালেরি টেইলরকে এ প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতাহীন করে রেখে দেওয়া কিংবা একেবারে বের করে দেওয়া থেকেও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর কাজ হচ্ছে তাঁর স্বপ্নটিকে ধ্বংস করে দেওয়া। ঠিক সেই কাজটিই শুরু হচ্ছে। আমরা দেখেছি একসময় যে প্রতিষ্ঠানে একজন মানুষ বিনা খরচে সেবা পেতে পারত এখন সেখানে ভর্তি হতেই আগাম দুই মাসের সিট ভাড়া বারো হাজার টাকা আর হুইল চেয়ারের দাম ছয় হাজার টাকাসহ মোট আঠারো হাজার পাঁচশত টাকা দিয়ে দিতে হয়। যাঁরা এখানে আসেন তাঁরা আগেই কোনো বড় দুর্ঘটনার শিকার, প্রাণ বাঁচানোর চিকিৎসায় সর্বস্বান্ত হয়ে এখানে এসেছেন একেবারে দুস্থ অবস্থায়। তাঁদের ওপর এ আর্থিক চাপের দুঃস্বপ্ন ভ্যালেরি টেইলর দেখেননি। তিনি বাণিজ্য করার জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি শুরু করেননি, এটাকে তিনি চকচকে প্রাইভেট ক্লিনিক বানাতে চাননি। টেলিভিশনে আমরা যে রকম চকচকে হাসাতালের বিজ্ঞাপন দেখি, তিনি সে রকম একটা প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন দেখেননি। অত্যন্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি হাসপাতাল তাঁর কল্পনাতে নেই, একেবারে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি যন্ত্রপাতি দিয়ে তিনি চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন। এখান থেকে মুনাফা অর্জন করে বিশাল সম্পদ বৈভব তৈরি করে আরও বিশাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য তৈরি করার তাঁর কোনো ইচ্ছে নেই। তাঁর স্বপ্ন একেবারে সাদামাটা মানুষের জন্য পুরোপুরি মানবিক একটা সেবা। তাঁকে সেই স্বপ্নকে আসলে এগিয়ে নিয়ে যেতে দিতে হবে—সেই দায়িত্ব এ দেশের মানুষের।

যে মমতাময়ী মহিলাটি আমরা আমাদের দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে গভীর ভালোবাসায় গ্রহণ করেছি, তাঁর স্বপ্নটিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব

আমাদের। আমরা চাইব এমন একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হোক যারা ভ্যালেরি টেইলরের স্বপ্নকে ধারণ করতে পারে, অনুভব করতে পারে। কোনো একদিন আমরা অথবা ভ্যালেরি টেইলর হয়তো থাকবেন না কিন্তু তাঁর স্বপ্নটি যেন বেঁচে থাকে। সেই স্বপ্নকে কেটে টুকরো টুকরো করে কেউ বিক্রি করতে পারবে না।

প্রথম আলো
৫ জুন ২০০৭

একটি লঙ্গরখানার কাহিনী

ঝর ঝর করে বৃষ্টি হচ্ছে, ছোট বাচ্চাগুলো ভিজে চুপসে গেছে। কিন্তু সেটা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই, মনে হয় তাদের আনন্দই হচ্ছে। আমি যখন তাদের বয়সী ছিলাম, তখন বৃষ্টিতে ভিজলে আমারও ওরকম আনন্দ হতো। তাদের সবার হাতে একটি গামলা বা ডেকচি, কেউ কেউ সেটা মাথায় দিয়েছে—বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য নয়, শিশু সুলভ খেলার ছলে। আমার কাছে একটা ক্যামেরা ছিল, আমি যখন তাদের ছবি তুলতে গেছি সবাই আনন্দে দাঁত বার করে হেসে দিল। আজকালকার ডিজিটাল ক্যামেরা অনেক 'হাইফাই' ছবি তোলা-মাত্রই সেটা দেখা যায়। আমি তাই ছবিগুলো বাচ্চাদের দেখালাম। তারা ছবির মাঝে নিজেকে খুঁজে বের করে তাঁদের মুখের হাসিকে আরও বিস্তৃত করে ফেলল। পেছন থেকে আরও কিছু বাচ্চা তাদের ছবি তোলার জন্য আমাকে ডাকাডাকি করতে থাকে। আমি কাছে এগিয়ে যেতেই বাচ্চাগুলো আনন্দে দাঁত বের করে হাসতে থাকে। তখন পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন বড় মানুষ তাদের বাজখাঁই গলায় ধমক দিলেন—"খবরদার হাসবি না।"

বাচ্চাগুলো হাসি বন্ধ করল, কয়েক মুহূর্তের জন্যই তারপর আবার তারা হাসিমুখে তাকাল। তারা আসলেই জানে না এটা একটা লঙ্গরখানার লাইন, এখানে দাঁড়িয়ে হাসতে হয় না। খুলনার খালিশপুরে বন্ধ হয়ে যাওয়া পাটকলের ছাটাই হওয়া অভুক্ত শ্রমিকদের জন্য এটা খোলা হয়েছে। খাবারের জন্য গামলা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা খুব অবমাননাকর, মানসম্মান খুইয়ে যারা এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের খুব লজ্জা হচ্ছে কিন্তু তারপরও এসেছে। পেটে ক্ষুধা থাকলে মানসম্মান লাজ-লজ্জার কথা মনে থাকে না। খালিশপুর পাটকলের শ্রমিকদের জন্য এটা আয়োজন করেছিল জাতীয় ত্রাণ কমিটি। বিচারপতি (অবঃ) মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী সভাপতি আমি একজন সদস্য। লঙ্গরখানা খোলার ব্যাপারটা দেখার জন্য আমি সিলেট থেকে এসে খুলনার খালিশপুর গেছি। খবরের কাগজ থেকে আমরা জানি

সেখানে পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে আছে। শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হয়েছে। অনেক শ্রমিক বহুদিন থেকে বেতন পান না, তাদের প্রাপ্য মজুরি পান না। হাজার হাজার মানুষ একটা ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে আছেন। আমি আগেও লক্ষ করেছি খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়ে তথ্যটুকু জানা যায়, পরিসংখ্যানগুলো জানা যায় কিন্তু তার মানবিক বেদনাটুকু চোখে পড়ে না। নিজের চোখে দেখলে হঠাৎ পুরো হাহাকারটুকু দেখা যায়, বুকের ভেতর থেকে আসা দীর্ঘশ্বাসটুকু শোনা যায়।

আমরা ঢাকা থেকে ভালো কাপড় জামা পরে এসেছি, তাই আমাদের দেখে মানুষজন ভিড় করে এল। কেউ অনেকদিন আগে ছাঁটাইয়ের চিঠি পেয়েছেন, কেউ পেয়েছেন সবেমাত্র। অনেকে বেতন পান না, অনেকে তাঁদের প্রাপ্য পাচ্ছেন না। কারও বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা করে রেখেছে—এখন কী করবেন বুঝতে পারছেন না। কারও ছেলে মেয়ে এসএসসি পাশ করেছে, কলেজে ভর্তি করার পয়সা নেই। তাঁদের সবার দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা শুনতে শুনতে আমি হুঁ-হুঁ করে মাথা নাড়ি। আমার নিজেকে তখন একটি প্রতারক বলে মনে হয়। যাঁরা অভিযোগগুলো করছেন তাঁদের অনেকেরই ধারণা, যেহেতু ঢাকা থেকে এসেছি, আমরা নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, আমাদের হাতে আছে আলাদিনের চেরাগ, সেটা দিয়ে তাদের সব দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনা-বেদনা দূর করে দেব। আমরা যারা গিয়েছি তারা শুধু জানি আসলে তাঁদের দুঃখের কথাগুলো জেনে সমবেদনা জানানো ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

২

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের বইয়ে লেখা ছিল পাট হচ্ছে সোনালি আঁশ, আমরা আরও জানতাম আদমজী জুটমিল হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাটকল। তারপর কীভাবে কীভাবে জানি হঠাৎ একদিন দেখতে পেলাম আদমজী জুটমিল চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলো। সবচেয়ে বেশি আপত্তি করার কথা ছিল শ্রমিকদের কিন্তু সরকার খুব ভাবনা চিন্তা করে শ্রমিক নেতাদের কিনে রেখেছে তাই কেউ আপত্তি করল না। শুধু খবরের কাগজে একটা ছবি দেখলাম একজন শ্রমিকের কিশোরী মেয়ে খবরটা শুনে অজ্ঞান হয়ে গেছে। সে বুঝতে পেরেছিল তার লেখা পড়া ও পুরো জীবন শেষ হয়ে গেছে। আমার মাঝে-মধ্যে জানতে ইচ্ছে করে, সেই মেয়েটি এখন কোথায় আছে, কেমন আছে।

বৃহস্পতিবার খবরের কাগজে দেখলাম আরও চারটি পাটকল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ১৪ হাজার শ্রমিককে চাকরি হারাতে হবে। উপদেষ্টার সংবাদ সম্মেলনটি আমি নিজে দেখিনি, শুনেছি। তিনি বেশ কয়েকবার জোর দিয়ে বলেছেন যে চারটি পাটকলকে কোনোভাবেই বাঁচানো সম্ভব নয়, সেগুলো বন্ধ করে দিতেই হবে। মাননীয় উপদেষ্টা নিশ্চয়ই পাটশিল্প বিশেষজ্ঞ নন, কাজেই সাংবাদিকদের সামনে খুব জোর দিয়ে যখন এই নিষ্ঠুর কথাগুলো বলতে হয় তাঁকে তখন অন্য অনেক মানুষের ওপর নির্ভর করতে হয়। সেই মানুষগুলো কারা আমার জানার কৌতূহল হয়। কারণ সব সময়েই দেখতে পাই এই সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে মানুষের দুঃখ-কষ্ট কখনো আলোচ্য বিষয় হিসেবে আসে না। (এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার কী অবলীলায় হাজার হাজার দরিদ্র মানুষের দোকানপাট উচ্ছেদ করে তাদের পথে বসিয়ে দিয়েছিল, মনে আছে?) আমরা খবরের কাগজে দেখেছি পাটশিল্প বিষয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এই টাস্কফোর্স পুরো বিষয়টি বিবেচনা করে একটা সিদ্ধান্ত দিলে সেই সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে পাটকল বন্ধ করে দেওয়া-না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে কি ভালো হতো না?

আমি পাট বিশেষজ্ঞ নই, পত্রিকায় পাট বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার চোখে পড়ে, কিন্তু যারা দেশের পাটশিল্পকে ধ্বংস করার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে বিশেষজ্ঞ হয়েছেন তাদের বক্তব্য পড়তে কেন জানি উৎসাহ হয় না। একেবারে সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা কিছু তথ্য জানি। সেগুলো এরকম, পৃথিবীতে পাট হঠাৎ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা শুধু পাটের 'দড়ি' আর 'ছালা' দেখেছি, কিন্তু এখন যে পাট দিয়ে গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে শুরু করে তার ভেতরের আস্তরণ পর্যন্ত তৈরি হয়, সেটা কি আমরা জানি? পৃথিবীতে খাদ্য শস্য রাখার জন্য যে পাটের তৈরি বস্তার ওপর কিছু নেই সেটা কি আমরা জানি? ছেলেবেলায় যে পাটকে আমরা সোনালি আঁশ বলতাম সেটাতো আসলেই সোনালি আঁশ।

অথচ সেই পাটকে আমরা কাঁচামাল হিসেবে বিক্রি করে দিই। আমাদের দেশের পাটকল একটা একটা করে বন্ধ হচ্ছে এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের পাশের দেশ ভারতে একটা একটা করে পাটকল তৈরি হচ্ছে। আমরা আমাদের পাট ভারতে পাঠাই তাদের পাটকলে প্রক্রিয়া করার জন্য, এর রহস্যটা কী?

যারা অর্থনীতিবিদ, তাঁরা মাঝে-মধ্যে আমাদের বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। বিশ্বব্যাংক ভারতে পাট শিল্পকে দাঁড় করানোর জন্য অনেক

টাকা পয়সা খরচ করেছে, কাজেই তারা মরণপণ করে তাদের পাটশিল্পকে দাঁড় করিয়েছে। কাজটা সহজ হয় যদি আমাদের পাটকলগুলো বন্ধ করে দেওয়া যায়। তাই একটা একটা করে পাটকল বন্ধ হচ্ছে। (এবারে অবশ্য একটা করে নয় আরও দ্রুত গতিতে চারটা করে।)

আমাদের সরকারের সিদ্ধান্তের সঙ্গে দেশের মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো যোগাযোগ নেই। নির্বাচিত সরকার যখন এ ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নেয় তখন তারা অন্তত যুক্তির খাতিরে বলতে পারে তারা দেশের জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কেন এত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত একা একা নিয়ে ফেলে?

দেশের মানুষজন আরও বিরক্ত হয় যখন আবিষ্কার করে তাদের আসল যে দায়িত্ব-নির্বাচন করার জন্য একটা ভোটার তালিকা তৈরি করা—সেই ব্যাপারে প্রবল আগ্রহ নেই। তাদের পুরো শক্তিটুকু ব্যয় করছে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের জন্য। প্রথম প্রথম আমরাও খুব উৎসাহিত হয়েছিলাম, এখন কেন জানি উৎসাহ হারিয়ে ফেলছি। এখন মোটামুটি পরিষ্কার যে সংস্কার অর্থ মাইনাস টু (এই মাইনাস টু কথাটার মানে কী, সেটা এখন বাচ্চা ছেলেও জানে!) এবং একজন রাজনীতিবিদ যদি ভয়ঙ্কর দুর্নীতিপরায়নও হন, তিনি যদি মাইনাস টু জেহাদে অংশ নেন, তবে তার কেশাগ্র স্পর্শ করা হবে না।

তবে আমি বস্ত্র ও পাটশিল্প উপদেষ্টাকে অবশ্যই একটা বিষয় নিয়ে সাধুবাদ দিতে চাই। তিনি বলেছেন এই বছর পাটমৌসুমেই তিনি প্রায় ২০০ কোটি টাকার পাট কেনার ব্যবস্থা করবেন। লঙ্গরখানা খোলার জন্য খালিশপুর গিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলে আমি একটি জিনিস জেনে এসেছি। সরকার পাট কেনার জন্য টাকাটা সময়মতো ছাড় দেয় না বলে অযথা অনেক বেশি মূল্যে পরে ফড়িয়াদের কাছ থেকে পাট কিনতে হয় এবং আমাদের দেশের পাটশিল্প ধ্বংস হওয়ার এটা হচ্ছে অন্যতম কারণ।

আমরা কেউই অস্বীকার করব না যে এই দেশটি আসলে ঠিকমত চলছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে পাটকল—সব জায়গায় সমস্যা এবং সেই সমস্যাগুলো ছোট-খাটো সমস্যা নয়, অনেক বড় সমস্যা। দেশের মানুষ ত্যাক্ত বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল বলে একটা বড় পরিবর্তনের জন্য খুব আশা করে আছে। এ সরকারের খুব বড় একটা সুযোগ ছিল, তারা সেই সুযোগটা নেবে বলে দেশের মানুষ কিন্তু খুব আশা করে আছে। মাইনাস টু ফর্মুলার মতো একেবারে হাস্যকর ছেলেমানুষী কিছু কাজ-কর্মে পুরো শক্তি

ব্যয় করে তারা সেই সুযোগটা নষ্ট করেছে। এই সুযোগটা নষ্ট হলে আবার কবে আমরা এমন একটা সুযোগ পাব?

৩

আমরা যখন খালিশপুর যাই তখনই একটা অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার টের পেতে শুরু করলাম। পুলিশ, এনএসআই, ডিজিএফআই—সবাই কেমন জানি শক্ত হয়ে গেছে। একটা পুরোপুরি মানবিক ব্যাপারের মধ্যে তারা কেমন জানি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেতে শুরু করেছে। সবাইকে জানিয়ে সবার অনুমতি নিয়ে এই পরিকল্পনাটা করা হয়েছে। খবরের কাগজের খবর পড়ে একটা বিপর্যয়কে বোঝা যায় না, একটা বিপর্যয়কে বোঝার জন্য মানবিক চোখে সেটা দেখতে হয়। আমরা সেই মানবিক কাজটুকু করার জন্য গিয়েছিলাম।

মাঝখানে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে বসেছি, সেটা ছিল অন্যরকম একটা সাংবাদিক সম্মেলন। তারা ক্রুদ্ধগলায় বললেন আপনারা তিন থেকে পাঁচদিনের জন্য এই লঙ্গরখানা খুলেছেন পাঁচদিন পর কী হবে? আমি সাংবাদিকদের প্রশ্ন করতে দেখেছি কিন্তু কখনো ক্রুদ্ধগলায় জবাবদিহি চাইতে দেখিনি। আমরা বোঝানোর চেষ্টা করেছি, আমরা এই বিশাল মানবিক বিপর্যয়ের সমাধান করতে পারব না। কিন্তু এই মানবিক বিপর্যয়ের কথাতো দেশের মানুষের কাছে বলতে পারব। এর বেশি আমরা কী করতে পারি?

আমরা যখন খালিশপুর থেকে চলে আসি তখন সেখানে একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটতে থাকে। যারা স্থানীয় শ্রমিক এবং লঙ্গরখানার জন্য কাজ করেছেন তাদের কয়েকজনের কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ শ্রমিক এলাকায় ঘুরিয়ে এনে ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে বসিয়ে দিল। যেখানে রান্নার আয়োজন সেখানে গিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে দিল। অনেক চিন্তা করে আমার মনে হলো, সরকারের নিশ্চয় ধারণা হয়েছে এই লঙ্গরখানা খোলায় তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। (মনে আছে ভাবমূর্তি? জোট সরকার তাদের ভাবমূর্তি নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল? জেএমবি-জামায়াত নিয়ে একটা কথা বললে তারা হই হই করে বলত ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!) এখন দেখি সেই একই ব্যাপার, অভুক্ত শ্রমিকদের একবেলা খিচুড়ি খাওয়ালে যদি সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সরকার কেন সেই অভুক্ত মানুষের দায়িত্ব নেয় না? এই মানুষগুলো কেন অভুক্ত রয়েছে? কে তাদের অভুক্ত রেখেছে? পুলিশ দিয়ে ভয় দেখিয়ে কি অভুক্ত মানুষকে শান্ত রাখা যায়?

৪

খালিশপুরের পুরো শ্রমিক এলাকাটা কেমন যেন ভুতুড়ে, সারি সারি দোকানপাট বন্ধ; বিবর্ণ বসতি। মানুষগুলোর মুখ ম্লান, চিন্তা ক্লিষ্ট। যখন চলে আসি তখন একজন বললেন, "আপনি কি জানেন গত কিছুদিনে এই শ্রমিকদের পরিবারের অনেক মেয়ে ডিসি অফিসে গিয়ে কাগজে স্বাক্ষর করে প্রস্টিটিউট হয়েছে!" (কোন শব্দটি লেখা শোভন আমি জানি না তাই যে শব্দটি শুনেছি হুবহু সেই শব্দটি লিখলাম।)

ডিসি অফিসে গিয়ে কাগজে স্বাক্ষর করে প্রস্টিটিউট হওয়া যায় আমি সেটাও জানতাম না। আমার খুব সৌভাগ্য যে রকম কোনো একটি মেয়ের সঙ্গে আমার সেখানে দেখা হয়নি। সেই মেয়েটি আমার চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেনি—"আপনারা আমার জন্য কী করেছেন"?"

আমি জানি আমাকে মাথা নিচু করে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে হতো।

অন্য সবার কথা থাক শুধু ওই মেয়েগুলোর কথা ভেবে এই দেশের মানুষ কি তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে না?

প্রথম আলো
২২ জুলাই ২০০৭

ভাই, দেশটা কোন দিকে যাচ্ছে?

আজকাল কারও সঙ্গে দেখা হলে দু-একটা কথার পর অবধারিতভাবে তিনি জানতে চান, "ভাই, দেশটা কোন দিকে যাচ্ছে বলতে পারবেন?" খবরের কাগজে আমি মাঝেমধ্যে লিখি বলে অনেকেরই ধারণা, আমি হয়তো অনেক কিছু জানি, অনেক কিছু বুঝি। ব্যাপারটা আসলে মোটেও সে রকম নয়। গত পাঁচবছর লুটপাটের নেতৃত্ব দিয়েছেন খালেদা জিয়া, ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছেন খালেদা জিয়া, কালো টাকা সাদা করেছেন খালেদা জিয়া; কিন্তু ঋণ করে অ্যারেস্ট হয়ে গেলেন শেখ হাসিনা—এই ব্যাপারগুলো বোঝা কি সহজ ব্যাপার? আমি নিজে বুঝি না, আমার চারপাশের কেউই বোঝে না, প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম যাঁরা দেশটা চালাচ্ছেন তাঁরা হয়তো বোঝেন, এখন মনে হচ্ছে তাঁরাও বোঝেন না।

সত্যি কথা বলতে কি সে জন্য তাঁদের দোষও দেওয়া যায় না। অনেক হইচই করে নির্বাচন করে যখন একটা রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসে, তারা ডজন ডজন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী নিয়ে দেশ চালায় পাঁচ বছর—এতেই তাদের মোটামুটি বারোটা বেজে যায়। অথচ এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মাত্র দশজন উপদেষ্টা নিয়ে টানা দুই বছর দেশ চালানোর সাহস করে ফেলেছেন। যাঁরা উপদেষ্টা হয়েছেন তাঁরা যে খুব অভিজ্ঞ, তাঁদের খুব সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে তাও নয়, তাই ছয় মাস যেতে না যেতেই আমরা সেটা টের পেতে শুরু করেছি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত নেন না, নিতে ভয় পান (উদাহরণ : শিক্ষা)। অনেক জায়গায় সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন নেই, আগ বাড়িয়ে নিয়ে বসে থাকেন (উদাহরণ : পাটকল)। ব্যাপারটা যখন পুরোপুরি লেজে-গোবরে হয়ে যায় তখন তাঁরা হৃদয়হীন কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। আমরা তখন চমকে চমকে উঠি, জোট সরকারের আমলে আমরা যে কথাগুলো শুনেছি, হুবহু সেই কথাগুলো শুনে আমরা অবাক হয়ে ভাবি, তাহলে কি জোট সরকারের প্রেতাত্মা এই সরকারের মাঝে বেঁচে আছে?

এত অল্প কয়েকজন অনভিজ্ঞ উপদেষ্টা চৌদ্দ কোটি মানুষের এত বড় একটা দেশ চালাতে গিয়ে নিশ্চয়ই হিমশিম খাচ্ছেন, তাই তাঁদের জন্য যেটা সহজ সেটাই করছেন, আগে যেভাবে চলত সেভাবেই চলতে দিচ্ছেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সময়টি ছিল গত জোট সরকারের আমল। বিএনপি এবং জামায়াত মিলে এই দেশটাকে যেভাবে লুটেপুটে খেয়েছিল, সেটা নিজের চোখে দেখে, নিজের কানে শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না। টাকা-পয়সার দুর্নীতি থেকেও বড় দুর্নীতি ছিল প্রশাসনের একেবারে রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিজেদের লোক বসিয়ে যাওয়ার দুর্নীতি। উপদেষ্টারা যখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন (কিংবা হাল ধরারই সাহস পাচ্ছেন না) তখন প্রশাসনের সেই আগের মানুষগুলোই দেশ চালাচ্ছে, ঠিক সেই আগের মতোই! এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে নব্বই দিনে ইলেকশন দেওয়ার থেকে তাদের অনেক বড় পরিকল্পনা আছে, তাহলে কি সে রকম একটা প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল না? বেশি উপদেষ্টা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কি দক্ষ উপদেষ্টা হতে পারত না? এখনো কি সময় নেই?

এই সরকার খুব বড় একটা সুযোগ পেয়েছিল, এত বড় একটা সুযোগ ভবিষ্যতে আর কোনো সরকার কোনো দিন পাবে বলে মনে হয় না। অত্যন্ত অস্থির একটা সময়ে তারা দেশের দায়িত্ব নিয়েছিল, সাধারণ মানুষকে তারা ভবিষ্যতের সুন্দর একটা বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। যেহেতু তারা কোনো রাজনৈতিক দলের সরকার ছিল না, তারা ইচ্ছা করলে রাজনৈতিক দলের সীমাবদ্ধ জগতের বাইরে খুব বড় বড়, খুব মহান কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারত। আমার মনে হচ্ছে, এই অসাধারণ সুযোগটি তারা অবহেলায় নষ্ট করছে। কত দ্রুত তারা এই দেশের মানুষের ভালোবাসা হারাচ্ছে তারা কি সেটা জানে? এই সরকার ব্যর্থ হলে কী ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে, উপদেষ্টারা এর মধ্যে সেটা নিয়ে আমাদের ভয় দেখাতে শুরু করেছেন। ব্যাপারটা কি একটু ছেলেমানুষী এবং হাস্যকর হয়ে গেল না? আমাদেরই কি এই সরকারকে ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয় দেখানোর কথা নয়?

২

সবকিছু নিয়ে মাঝেমধ্যে যখন মন খারাপ হতে চায় তখন আমি জানুয়ারির এগারো তারিখের কথা ভাবি। সেই দিন যদি পট পরিবর্তন না হতো, তাহলে হয়তো জানুয়ারির বাইশ তারিখ সত্যি সত্যি কোনো এক ধরনের নির্বাচন হয়ে যেত। বিএনপি এবং জামায়াতের সেই ভয়ঙ্কর মানুষগুলো

আবার ক্ষমতায় এসে তখন এই দেশটার কী অবস্থা করত? সেই ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য আমি সব সময় এই সরকারের প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাই। বিএনপি এবং জামায়াত সরকার তাদের আমলে নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, বিচার বিভাগ, পুলিশ, সরকারি কর্মকমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন—এ রকম প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই সরকার এ রকম প্রতিটা প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে ওপরের পদে বিশ্বাসযোগ্য একজন খাঁটি মানুষকে বসিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষা করার চেষ্টা করছে। তারা যদি এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা করতে পারে, আমি মনে করি সেটা দেশের জন্য একটা বিশাল বড় কাজ হবে।

আমি মনে করি, আমার মতো আরও অনেকে এই সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টাগুলোকে মমতার সঙ্গে বিবেচনা করে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে—তাদের সবাইকে নিরাশ করাটা হবে খুব দুঃখের একটা ব্যাপার।

৩

অনেকেই হয়তো লক্ষ করেছেন, এই সরকারের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আজকাল সংবাদপত্রগুলো প্রায়ই বলে "সেনাসমর্থিত সরকার"। তার মানে কিন্তু এই নয় যে নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারগুলো হচ্ছে "সেনা অসমর্থিত" বা তাদের প্রতি সেনাবাহিনীর সমর্থন থাকে না। "সেনাসমর্থিত" কথাগুলো যোগ করে দিয়ে আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে এই সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনেক কিছুই সেনাবাহিনীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। এটা সত্যিকারের সামরিক শাসন নয়, কিন্তু তার গন্ধটুকু আছে। এই তো সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র আমাকে অভিযোগ করে বলেছেন, সেনা সদস্যরা এসে তাঁর লম্বা চুল কেটে ফেলতে চেয়েছে। সামরিক শাসনের প্রথম চিহ্নটা সব সময়ই লম্বা চুল কাটার উৎসাহ দিয়ে শুরু হয়। ভাগ্যিস কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম বা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতো মানুষের এখন বাংলাদেশে থাকতে হচ্ছে না, তাহলে তাঁদের মানসম্মান নিয়েই টানাটানি পড়ে যেত!

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন, আমি চুল কাটা নিয়ে অভিযোগ করতে এসেছি, বাংলাদেশে এখন সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য নিয়ে আরও বড় বড় অভিযোগ আসছে। অন্য সবার বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা খবরের কাগজে ছাপানো যায়, কিন্তু সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা খবরের কাগজে

ছাপানো খুবই কঠিন। তার পরও আমরা দেখতে পেয়েছি, ১৬ আগস্ট *প্রথম আলোয়* ছাপা হয়েছে—কুমিল্লায় আলমগীর হোসেন নামে একজন রাজমিস্ত্রীকে সেনাসদস্যরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছেন। আরেকজনের পা থেঁতলে দেওয়া হয়েছে; সে এখন হাসপাতালে। মানুষটির অপরাধ—হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়ায় সে দৌড়ে একজনের ছাতার নিচে আশ্রয় নেওয়ার দুঃসাহস দেখিয়েছিল! সেই ছাতার নিচে একজন খুব বড় সেনা কর্মকর্তার আত্মীয়া ছিলেন। খবরের কাগজ তন্ন তন্ন করেও সেই সেনা কর্মকর্তার নাম খুঁজে পেলাম না। এই দেশে কী তাদের জন্য একটা অলিখিত ইনডেমনিটি ঘোষণা করা হয়েছে?

কিছুদিন আগে আমার কাছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছু কাগজপত্র এসেছে। সেখান থেকে একটা অত্যন্ত বিচিত্র তথ্য জানতে পেরেছি। গত ২ জুলাই স্থানীয় এরিয়া কমান্ডার হিসেবে সেনাবাহিনীর মেজর ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে একটি বিভাগের পাঁচজন শিক্ষককে নিয়োগ দেওয়ার "নির্দেশ" দেন। উপাচার্য মহোদয় সেই নিয়োগপত্র ইস্যু করতে বাধ্য হন এবং রহস্যময় কারণে তিনি খুব গোপনে পদত্যাগ করে ফেলেন। ভেতরের ব্যাপার আমরা কিছু জানি না; শুধু এটুকু জানি—এই দেশে, এই সময়ে একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে একজন মেজর পাঁচজন শিক্ষকের নিয়োগপত্র ইস্যু করিয়ে নিয়ে যেতে পারেন! এটা চলেশ রিছিল হত্যা বা রাজমিস্ত্রী আলমগীর হোসেন হত্যার মতো হৃদয়বিদারক নৃশংস ঘটনা নয়, কিন্তু দেশের জন্য এটা খুব বড় ঘটনা। যদি এটাই একটা নুতন প্রক্রিয়ার শুরু হয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব বলে কিছু থাকবে না।

আমাদের দেশের সেনাপ্রধান অনেকবার দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাজকর্মের সমালোচনা করেছেন। স্বাধীনতার পর অর্ধেক সময় সেনাবাহিনী এবং বাকি অর্ধেক সময় রাজনীতিবিদেরা দেশ শাসন করেছেন, কিন্তু অপশাসনের পুরো দায়িত্বটুকুই নিতে হয় রাজনীতিবিদদের। আমরা খুব ভালো করে জানি, এ দেশের সেনা শাসকেরা দেশের অনেক বড় সর্বনাশ করেছেন, কিন্তু তাঁদের সে জন্য কখনো দায়ী করা হয় না। এ মুহূর্তে দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক শাসন নেই, কিন্তু সারা দেশেই সেনাবাহিনীর এক ধরনের সচেতন উপস্থিতি অনুভব করা যায়। দেশের ছোট ছোট শহরগুলো থেকে অনেকে কাতর গলায় আমার কাছে নির্যাতনের কাহিনী বলেছেন। আমি শুধু শুনেছি, তাঁদের সুবিচার পাওয়ার পথ দেখাতে পারিনি। কিন্তু

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনাটি সম্ভবত সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেশের প্রকৃত অবস্থাটার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

৪

আমাদের সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ মুক্তিযোদ্ধাদের একটি আয়োজনে বলেছিলেন, এই দেশের মাটিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হবে। বাংলাদেশকে তার সত্যিকার অবস্থানে দাঁড় করানোর প্রথম পদক্ষেপ যদি হয় বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া, তাহলে দ্বিতীয় পদক্ষেপটিই হবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা। এই সরকার দেশের দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই জেনারেল মইন উ আহমেদ দুটো ঘোষণাই দিয়ে দেশের মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। আমরা সবাই আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

তারপর অনেক দিন পার হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যে এখনো ভাসা ভাসাভাবে বঙ্গবন্ধুর কথা শুনি কিন্তু যুদ্ধাপরাধীর বিচারের কথাটা একেবারেই চাপা পড়ে গেছে। বরং একজন উপদেষ্টার মুখে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে সাফাই গাইতে শুনে আমরা রীতিমতো আঁতকে উঠেছি।

এ রকম একটা অবস্থায় আমি যদি প্রতারিত অনুভব করি, তাহলে কি কেউ আমাকে দোষ দিতে পারবে? সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ কি পরিষ্কার করে আমাদের জানাবেন, এই দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার যে প্রতিশ্রুতিটুকু দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতিটুকু কি তিনি রাখবেন?

৫

সারা দেশে এখন থই থই বন্যা। সেদিন একটা ত্রাণ কমিটির সঙ্গে কাছাকাছি একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। বন্যার ত্রাণে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য যাইনি, গিয়েছিলাম নিজের চোখে দেখতে। সব সময় যা হয়, তা-ই হলো। গিয়ে দেখা গেল যেটুকু ত্রাণ নিয়ে যাওয়া হয়েছে, মানুষ তার থেকে অনেক বেশি। যারা ত্রাণ পায়নি, তাদের শুকনো মুখ দেখে বুকটা ভেঙে যায়। এক মুঠো খাবারের জন্য একজন শিশু তার মায়ের হাত ধরে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে, পৃথিবীতে এর চেয়ে করুণ দৃশ্য কি আর কিছু হতে পারে?

যারা স্থানীয় মানুষ, আমি তাদের কাছ থেকে বন্যার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের দেশের কিছু বিখ্যাত বন্যা আছে

(আটানব্বইয়ের বন্যা, দুই হাজার চারের বন্যা), সেই তুলনায় এটা কী রকম জানতে চেয়েছিলাম। সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "পানি আগের থেকে বেশি হবে না কম হবে আমরা সেটা জানি না। কিন্তু এই বন্যাটা হবে সবচেয়ে ভয়াবহ। তার কারণ হচ্ছে জিনিসপত্রের দাম। আগে মানুষজন যে জিনিসটা কোনোভাবে কষ্ট করে কিনতে পেরেছে, এই বছর কেউ তারা ধারে-কাছে যেতে পারছে না।" অনাগত দিনগুলোর কথা ভেবে সবাই ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রকৃতি এসে প্রতি বছরই আমাদের ওপর এই আঘাত করে যায়, কিন্তু আমরা যখন প্রকৃতির ওপর অপেক্ষা না করে যেচে পড়ে মানুষের ওপর আঘাত করি তখন তার জবাব কে দেবে? কথা নেই, বার্তা নেই কলমের এক খোঁচায় পাটকলগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, সেই সিদ্ধান্তগুলো কে নিচ্ছে? আমাদের দেশের পাটশিল্পকে একেবারে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিয়েছে বিজেএমসি নামে যে প্রতিষ্ঠান, আমরা তাদের কেন শাস্তি দিচ্ছি না, দুর্নীতির জন্য তাদের কেন জেলে নিচ্ছি না? তা না করে শাস্তি দিচ্ছি পাটকল শ্রমিকদের! আমি লিখে দিতে পারি যে উপদেষ্টা কাগজে স্বাক্ষর করে পাটকলগুলো বন্ধ করেছেন, তিনি যদি সেই এলাকায় গিয়ে অভুক্ত শিশুগুলোকে নিজের চোখে একবার দেখে আসতেন তাহলে কোনো দিন সেই পাটকলগুলো বন্ধ করতে পারতেন না—তিনি তাঁর উপদেষ্টার চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে এসে বসে থাকতেন।

আমি যখন খুব ছোট তখন একবার গ্রামে গিয়েছি এবং আমার এক চাষি মামা আমাকে একটা খুব মজার জিনিস বলেছিলেন। প্রকাণ্ড একটা তেজী ষাঁড়কে মাঠে খুঁটি দিয়ে বেঁধে রাখতে রাখতে বলেছিলেন, "এই যে ষাড়টা দেখছ, এর গায়ে এত জোর যে সে যদি শুধু তার ঘাড়টা দিয়ে একটা হ্যাঁচকা টান দেয়, দড়িটা পটাং করে ছিঁড়ে যাবে! ষাঁড়টা সেটা জানে না বলে আমরা এটাকে বেঁধে রাখতে পারি—তা না হলে এটাকে বেঁধে রাখার সাধ্য কারও আছে?"

গত কিছুদিন থেকে আমার শুধু সেই ষাঁড়ের কথা মনে হচ্ছে—দেশের অবস্থা অনেকটা সে রকম। দেশের মানুষ তেজী ষাঁড়ের মতো—তাদের গলায় জরুরি অবস্থা, যৌথ বাহিনী, পুলিশ, মিলিটারি, র‍্যাব, মামলা-মোকদ্দমার একটা পলকা দড়ি। মানুষ রাজি আছে বলে সেটা গলায় ঝুলিয়ে অপেক্ষা করছে—কোনো কারণে যদি অধৈর্য হয়ে যায়, অশান্ত হয়ে যায়, একটা হ্যাঁচকা টান দিলেই সেটা পটাং করে ছিঁড়ে যাবে। এই সরকারের

কাছে বিনীত অনুরোধ, দেশের মানুষকে অশান্ত করবেন না, মাঠে-ঘাটে ছুটে যাওয়া ক্ষিপ্ত ষাঁড়কে আমরা আর দেখতে চাই না।

৬

এটা আগস্ট মাস, বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করার মাস। কোন সরকার কখন কীভাবে তাঁকে কতটুকু সম্মান দেবে আমরা জানি না, কিন্তু যত দিন বাংলাদেশ নামে দেশটি পৃথিবীতে টিকে থাকবে, তত দিন এই মানুষটিও পৃথিবীর ইতিহাসে বেঁচে থাকবেন। বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু সমার্থক শব্দ। যদি বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হতো তাহলে এই বাংলাদেশেরও জন্ম হতো না।

তাঁর জন্য এই দেশের দুঃখী মানুষের পক্ষ থেকে ভালোবাসা এবং ভালোবাসা।

প্রথম আলো
২০ আগস্ট ২০০৭

প্রতিপক্ষ যখন ছাত্র-শিক্ষক

সাহস মাপার কোনো সহজ নিয়মের কথা আমার জানা নেই, তবে আমার ধারণা যে মানুষ যত সহজে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে,তার সাহস তত বেশি। সেই হিসেবে এই দেশের সবচেয়ে সাহসী মানুষদের একজন নিশ্চয়ই কর্নেল তাহের। জিয়াউর রহমান ষড়যন্ত্রের একটা বিচার করে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। কর্নেল তাহের যেভাবে তাঁর মৃত্যুদণ্ডটি গ্রহণ করেছিলেন, তার কোনো তুলনা নেই। ঘুম থেকে উঠে নাশতা করে পরিষ্কার কাপড় পরে নিজের প্রিয় কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ফাঁসির মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, কাউকে তাঁকে স্পর্শ করতে দেননি, ফাঁসির দড়িটি নিজের গলায় পরে নিতে গিয়ে একবারও তাঁর হাত কাঁপেনি। গল্প-উপন্যাস বা রূপকথার নায়কদের থেকেও তাঁর সাহস আর বীরত্ব অনেক বেশি ছিল।

কর্নেল তাহেরেরা পাঁচ ভাই। পাঁচ ভাই-ই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। সারা দেশে যদি একজনও সত্যিকারের বীরপ্রসবিনী মাতা খুঁজে বের করতে হয়, তাহলে এই পাঁচ ভাইয়ের মাতাকে সেই সম্মানটুকু দিতে হবে। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এই বীরপ্রসবিনী মাতার সন্তানেরা অবলীলায় প্রাণ দিয়েছেন। এই পাঁচ ভাইয়ের একজনকে আমি চিনি, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, এই মুহূর্তে তিনি জেলে। যৌথ বাহিনী, পুলিশ মিলিটারি, আদালত তাঁর ভেতর থেকে কী তথ্য বের করছে আমি জানি না। তবে আমি নিশ্চিতভাবে জানি, এই দেশের জন্য তাঁর মমতার মধ্যে বিন্দুমাত্র খাদ নেই।

বাংলাদেশের ইতিহাসে যেটা কখনো ঘটেনি এখন সেটা ঘটেছে, ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকদের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। দুই রিমান্ডের মাঝখানে প্রফেসর আনোয়ার হোসনকে একবার আদালতে আনা হয়েছিল, তখন তিনি এই সেনাবাহিনীর "সাধারণ জওয়ান" থেকে শুরু করে "সর্বপ্রধান"এর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। বাংলাদেশের মানুষ এই দেশে যত

বিচিত্র ঘটনা দেখেছে, এ ঘটনাটি সম্ভবত তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিচিত্র। সাংবাদিকদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছেন, সেই কথাগুলো যদি তিনি নিজের ক্যাম্পাসে কিংবা নিজের বাসায় বসে উচ্চারণ করতেন, তাহলে দেশের মানুষ সেগুলো হয়তো বিশ্বাস করত, রিমান্ডের মাঝখানে তিনি যখন সেই কথাগুলো উচ্চারণ করেন তখন সাধারণ মানুষ কথাগুলো বুঝতে পারে না; বরং এক অজানা আশঙ্কায় তাদের বুক কেঁপে ওঠে। পুরো ঘটনাটাকে মনে হয় একটি পরাবাস্তব নাটক। নাটকের অভিনেতাদের আমরা চিনি, নাটকের দর্শকদের আমরা চিনি, কিন্তু কে এই নাটক লিখেছে, কে এটি পরিচালনা করেছে তাদের আমরা চিনি না। তাদের পরিচয় জানার জন্য আমাদের কত দিন অপেক্ষা করতে হবে?

বিষয়টিতে আরও জটিলতা রয়েছে, *প্রথম আলোয়* একজন সাংবাদিক সাহস করে সেই কথাগুলো লিখেছেন। প্রফেসর আনোয়ার হোসেন যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলো তাঁর পুরো কথা নয়—তিনি আরও কিছু কথা বলেছিলেন, সে কথাগুলো প্রচার করা হয়নি। পুরো বক্তব্যটা একসঙ্গে শুনতে পেলে তার অর্থ বোঝা যায়, বক্তব্যের ভগ্নাংশ অনেক সময় পুরোপুরি ভুল অর্থও বোঝাতে পারে।

কখনোই একজন মানুষের অর্ধেক কথা প্রচার করতে হয় না। মানুষটি তাঁর বক্তব্যকে অর্থবহ করার জন্য অনেক কিছু বলতে পারেন, সেখান থেকে বেছে বেছে কিছু কথাকে প্রচার করা হলে তাঁর বক্তব্যের পুরো অর্থটুকু ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। মানুষটি যদি সেটা সম্পর্কে জানেন, তার প্রতিবাদ করার একটা সুযোগ থাকে। কিন্তু সেই মানুষটি যদি জেলে আটক থাকেন, তাহলে তিনি কী করবেন? আটক থাকা অবস্থায় প্রফেসর আনোয়ার হোসেনের তো কোনো বক্তব্যই দেওয়ার কথা নয়, তাহলে পুলিশ কেন তাঁকে এই বক্তব্যটি দিতে দিয়েছিল? কে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে?

যাঁরা নিয়মিত টেলিভিশন দেখেন, তাঁদের কাছে শুনেছি আমাদের দেশের সব টেলিভিশন চ্যানেল নাকি এখন বিটিভিতে পরিণত হয়েছে। সব টেলিভিশন চ্যানেলে প্রফেসর আনোয়ার হোসেনের বক্তব্য এবং তার পাশাপাশি জ্বালাও-পোড়াও ঘটনার ভিডিও ক্লিপ দেখানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র তার পুরো ক্ষমতা নিয়ে নেমেছে—কিছুদিন আগে হলেও আমি কি এটা বিশ্বাস করতাম? আওয়ামী লীগ আমলে তারা তাদের প্রতিপক্ষ বিএনপিকে নিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান করত, বিএনপি আমলে তারা তাদের প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগকে

নিয়ে এ অনুষ্ঠান করেছে। এখন এটি কার আমল? কেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে এই অনুষ্ঠান করছে? এ সরকার তাহলে কি আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের জানিয়ে দিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাই তাদের প্রতিপক্ষ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা নিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন তাদের সঙ্গে আরও বেশকিছু শিক্ষক যুক্ত হয়েছেন। সবার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, যাঁদের সঙ্গে পরিচয় আছে, তাঁদের প্রতি আমার এক ধরনের সম্মানবোধ আছে। দেশে যদি জরুরি অবস্থা না থাকত, খবরের কাগজে সবকিছু যদি খোলামেলাভাবে লেখা হতো, টেলিভিশনে যদি খোলামেলা আলোচনা হতো, তাহলে আমরা পরিষ্কার করে জানতে পারতাম, ঠিক কী অপরাধে তাঁদের ধরা হয়েছে। আমি নিজে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সেই হিসেবে অনুমান করতে পারি, তাঁরা যেটা করেছেন, সেটা সত্যি জেনে করেছেন। সেই সঙ্গে এটাও আশঙ্কা করতে পারি, হয়তো তাঁরা এমন কিছু করেননি, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ কেউ আগে থেকেই তাঁদের দোষী হিসেবে বিশ্বাস করে আছেন। এখন তাঁদের দোষী হিসেবে প্রমাণ করতে হবে—সেটা এমন কী কঠিন?

২

একেকটি সময়ে একেকটি শব্দ হঠাৎ করে পরিচিত হয়ে ওঠে, আমরা কারণে-অকারণে সেই শব্দগুলো ব্যবহার করি। জোট সরকারের আমলে সে রকম একটা শব্দ ছিল "ভাবমূর্তি"। কেউ কিছু বললেই সরকার হা হা করে উঠত, বলত, তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! (সেই মানুষগুলোকে আমার খুঁজে বের করে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, এখন তাঁরা কী বলবেন? তাঁদের নিজেদের ভাবমূর্তি এখন কোথায় গেছে?) দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা নতুন যে শব্দটার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, সেটা হচ্ছে "সংস্কার"। রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজেদের গা বাঁচানোর জন্য এখনো "সংস্কার" নামে একটা কথা বলে যাচ্ছেন, দেশের সাধারণ মানুষ সেটা নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছে না। কে নেতা হবেন, কে জেলের বাইরে থাকবেন, কে দেশ থেকে পালাবেন—সেটা তাঁদের ব্যাপার, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সেটাতে আগ্রহ নেই। রাজনৈতিক নেতারা যখন এই দেশের মানুষের জন্য কী করবেন সেটা বলতে শুরু করবেন, তখন তাঁদের আগ্রহ ফিরে আসবে। আমরা সাধারণ মানুষেরা জানতে চাই, এ দেশের

ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া নিয়ে তাঁরা কী ভাবছেন, চাষিদের নিয়ে কী ভাবছেন, বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কী পরিকল্পনা করছেন, পাটকলগুলো উদ্ধার করার জন্য তারা কী করবেন, কয়লানীতি কী হবে, বিশ্বব্যাংক আর আইএমএফের পদলেহন করবেন কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। সংস্কারের নামে নিজেদের আখের গোছানোর ব্যাপারটা ছেড়ে রাজনৈতিক নেতারা যত তাড়াতাড়ি এই বিষয়গুলোয় ফিরে আসবেন ততই মঙ্গল। নিজের জন্য কারও রাজনীতি করার কথা নয়, রাজনীতি করার কথা পরের জন্য, দেশের মানুষের জন্য।

"সংস্কার" শব্দটার পর ইদানীং আরও একটা শব্দ আজকাল ঘন ঘন ব্যবহার হচ্ছে। সেই শব্দটা হচ্ছে "তুচ্ছ"। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর অসংখ্য লেখালেখিতে বলা হয়েছে "তুচ্ছ" একটা ঘটনার কারণে সারা দেশে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে। আসলে কিন্তু ঘটনাটি মোটেও "তুচ্ছ" ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের গায়ে হাত তোলার মতো ঘটনাকে "তুচ্ছ" বলা হয় কেন? তাহলে কি আমরা এভাবেই ছাত্রদের মানুষ করব, যে একজন এসে তাকে শারীরিকভাবে আঘাত করলে সেটাকে তারা "তুচ্ছ" ঘটনা হিসেবে মনে করে অপমানটুকু সহ্য করবে? সেই শৈশবে আমার শিক্ষক যখন আমার গায়ে হাত তুলেছেন, আমি তো সেই অপমানটুকু অর্ধশতাব্দী বছর পরেও ভুলতে পারি না। তাহলে কি আমরা চাইছি আত্মসম্মানহীন একটা নতুন প্রজন্ম বড় হোক, তাদের মান-সম্মান না থাকুক, তাদের গায়ে হাত তোলার পর এই দেশের সব সুশীল সমাজ বলুক তুচ্ছ ঘটনা, তুচ্ছ ঘটনা?

সবাইকে স্বীকার করে নিতে হবে এটা তুচ্ছ ঘটনা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ঘটনাগুলোকে তুচ্ছ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করা হবে, তত দিন কিন্তু সমস্যার সমাধান করা যাবে না। জোর করে, ভয় দেখিয়ে অত্যাচার করে যে সমস্যার সমাধান করা যায় না, সে কথাটি বাংলাদেশের মানুষের থেকে ভালো করে কে জানে?

৩

কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়া হয়েছে, কিছু কিছু এখনো খোলা হয়নি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে একটা অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার ঘটানো হয়েছে : এখানে ত্রিশজনের নামে মামলা দেওয়া হয়েছে। তথ্যটি যখন টেলিভিশনে দেখানো হয়, সেখানে লেখা ছিল "ভাঙচুরের" কারণে এই

মামলাগুলো দায়ের করা হয়েছে। যে জিনিসটি রহস্যময় সেটি হচ্ছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাঙচুর দূরে থাকুক, একটা গাছের পাতাও ছেঁড়া হয়নি। বিষয়টি আমি খুব ভালো করে জানি। কারণ, আমি নিজে সম্মিলিত ছাত্রদের হাত তুলে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলাম, যে তারা যেন কোনো ধরনের সহিংসতায় না যায়। তারা তাদের কথা রেখেছিল কিন্তু তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু দেওয়া হয়নি। এই ত্রিশজনের ভেতর শুধু একজন ছাত্রের নাম দেওয়া আছে, বাকি উনত্রিশজনের কোনো নাম নেই। এই লেখাটি যখন ছাপা হচ্ছে তখন জানতে পেরেছি শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশ কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে মামলাটি প্রত্যাহার করতে বলেছে।

এর আগে আমরা এ রকম বিরাশি হাজার নামহীন মানুষের বিরুদ্ধে মামলার কথা খবরের কাগজে পড়েছি—বাংলাদেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রছাত্রীর নাম ঢুকিয়ে দিয়ে প্রয়োজনে সবাইকে শায়েস্তা করে ফেলার একটা অভূতপূর্ব পরিকল্পনা ছিল। এ ধরনের হাস্যকর এবং ছেলেমানুষী প্রতিহিংসাপরায়ণ পরিকল্পনার কথা কি এ দেশের মানুষ কখনো শুনেছে? ভবিষ্যতে কখনো শুনবে? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মামলাগুলো নিয়ে আমি একটু খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম, যেহেতু খবরের কাগজে আজকাল সব খবর ছাপা হয় না, তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে খোঁজ নেওয়া ছাড়া উপায় কী? ত্রিশ মামলার কারণটা বোঝার জন্য বিজ্ঞানী আইনস্টাইন হতে হয় না, নামহীন এ মামলার ভারি সুবিধে, যখন যাকে প্রয়োজন তাকে সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে, তাই সবাই তটস্থ হয়ে থাকবে, কেউ পান থেকে চুন পর্যন্ত খসাবে না। এই বুদ্ধিটি কার, সেটা সন্দেহাতীতভাবে বের করা যায়নি; তবে জোর গুজব, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষই একটু উৎসাহ দেখিয়েছে! ব্যাপারটি অসম্ভব কিছু নয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা গ্রেপ্তার হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগ বাড়িয়ে তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করার ঘোষণা দিয়ে ফেলল। যেসব শিক্ষক গ্রেপ্তার হয়েছে, তাঁদের সবাই প্রগতিশীল ধাঁচের, কাজেই বিরুদ্ধ দলের শিক্ষকদের মুখে এখন চাপা আনন্দের আভা। জোট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের দলের উপাচার্য বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, তারা তাদের দলবল নিয়ে এখনো মহাআনন্দে রাজত্ব করে যাচ্ছেন; সিন্ডিকেট, সিলেকশন কমিটি, প্রভোস্ট, প্রক্টর কিছু পরিবর্তন করা হয়নি। তার সত্যিকার কারণটি জানা নেই বলে আমরা শুধু অনুমান করতে পারি—সেই অনুমানে কোনো আনন্দ নেই, ভরসা নেই।

উপাচার্য নিয়োগ দেওয়ার জন্য একটি সার্চ কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। তারা চুপচাপ বসে আছেন কেন জানার কৌতূহল হয়। বাংলাদেশের সব প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় মানুষগুলোর পরিবর্তন করা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় কি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয়? তাদের নেতৃস্থানীয় মানুষগুলোর পরিবর্তন হচ্ছে না কেন? সহকর্মী শিক্ষকদের জন্য মায়া আছে, শ্রদ্ধাবোধ আছে—এ রকম উপাচার্যের দরকার এর চেয়ে বেশি কখন হতে পারে?

৪

গত কিছুদিন হলো খবরের কাগজের একটা গুণগত পরিবর্তন হয়েছে, এদের মধ্যে একটা চাটুকারিতার ভাব চলে এসেছে। সবাই যে চাটুকারদের মতো লিখছেন তা নিশ্চয়ই সত্যি নয়, কিন্তু যেগুলো সেই ধাঁচের, সেগুলো বেশি ছাপা হচ্ছে। টেলিভিশনগুলোর অবস্থা আরও বেশি খারাপ, একটা চ্যানেল তো বন্ধই করে দেওয়া হলো। দেশের গুরুত্বপূর্ণ খবর আর পাওয়া যাচ্ছে না, বিষয়টা আরও জটিল করার জন্য গোয়েন্দা সংস্থা থেকে খবর সরবরাহ করা হচ্ছে, টেলিভিশনে ভিডিও ক্লিপিং সরবরাহ করা হচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, সরকারের আত্মবিশ্বাস হঠাৎ করে তলানিতে নেমে এসেছে, খবরের কাগজের গলা চেপে ধরে সেই আত্মবিশ্বাস কখনোই ফিরে আসবে না। আমাদের দেশের গোয়েন্দা বাহিনী সরকারকে সত্যিকার খবর দিতে পারে, আমি সেটা মনে করি না (আমার সেটা বিশ্বাস করার কারণ আছে)। সরকারের জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় আছে খবরের কাগজ আর টেলিভিশনকে পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দেওয়া, দেশের সব খবর সেখানে আসুক—দেশের মানুষের অনুভূতিটা বোঝার জন্য এর চেয়ে সহজ উপায় আর কিছু হতে পারে না।

বর্তমান সরকার তাদের সাফল্যের জন্য যেটুকু ব্যস্ত, এ দেশের সাধারণ মানুষ কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি ব্যস্ত। এ দেশের মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সচেতন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর শিক্ষক। তাঁরা কী বলছেন সেটা শুনতে হবে, কেন তাঁরা আইন ভাঙছেন সেটা বুঝতে হবে। '৫২ সালে তাঁরা আইন ভেঙেছিলেন বলে আজ আমি বাংলায় কথা বলতে পারি। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ যাঁদের আইন ভঙ্গকারী দুষ্কৃতকারী বলা হয়েছিল, ষোলই ডিসেম্বর দেশ তাঁদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বরণ করেছিল। কাজেই সরকারকে সেটা বুঝতে হবে—"আইন ভঙ্গ করেছে" তথ্যটি কিন্তু যথেষ্ট নয়, লাখো কোটি টাকা লুটপাট করে আইন ভঙ্গ করা আর একটি আদর্শিক

অবস্থান থেকে বক্তব্য দেওয়া কিন্তু এক ধরনের অপরাধ নয়। ছাত্র ও শিক্ষকেরা কিন্তু তাঁদের প্রাপ্য সম্মানটুকুই চাইছে, তার বেশি কিছু চাইছে না।

রোজা চলছে, দেখতে দেখতে ঈদ চলে আসবে। ঈদের আগে জেলখানায় আটক থাকা ছাত্র এবং শিক্ষকদের কি ছেড়ে দেওয়া যায় না? এই ছাত্র এবং শিক্ষকদের আপনজনের দীর্ঘশ্বাস কি সত্যি এ সরকারের প্রয়োজন আছে? সব বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার আগে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের জন্য একটুখানি সম্মানবোধ, একটুখানি ভালোবাসা দেখালে এই দেশে কী ম্যাজিক হয়ে যেতে পারে, তাঁরা কি সেটা জানেন?

প্রথম আলো
২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৭

ভাঙা রেকর্ডটা আরেকবার বাজাই?

শৈশবে আমরা যখন গ্রামোফোনে গান শুনতাম তখন কখনো কখনো পুরোনো রেকর্ডের একটা খাঁজে গ্রামোফোনের পিনটা আটকে যেত। সেই বৃত্তাকার খাঁজে গানের যেটুকু অংশ থাকত সেই অংশটিই তখন ঘুরে ঘুরে বারবার বাজাতে থাকত। কেউ একজন গ্রামোফোনের পিনটা তুলে সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সেই যন্ত্রণা থেকে কারও মুক্তি ছিল না।

কয়দিন থেকে মনে হচ্ছে আমি বুঝি সেই ভাঙা রেকর্ড আর আমি নিজেকে শুধু বাজিয়েই যাচ্ছি। গত এক বছরে আমি যতবার সুযোগ পেয়েছি, লিখে হোক, মুখে বলে হোক, টেলিভিশন ক্যামেরায় হোক, গোলটেবিল বৈঠকে হোক, গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সামনে হোক আমি এই কথাগুলো বলে একটা গুরুতর সমস্যার দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি। যে মানুষগুলোর মুখের কথার মুহূর্তের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হতে পারত তাঁরা এটি নিয়ে কিছু বলেন না, কিছু করেনও না। হয়তো এর ভেতরে আরও কোনো রহস্য আছে, যে রহস্যের কথা আমরা জানি না। (মামা-ভাগ্নে জুটির ভাগ্নে তারেক রহমানকে ধরা হলো, মামা সাঈদ এস্কান্দারকে স্পর্শ না করার পেছনে যে রহস্য আছে, সে রকম কোনো রহস্য।) তা না হলে এ দেশের এত বড় একটা ব্যাপার সবাই কেমন করে এড়িয়ে গেল?

ভাঙা রেকর্ডের মতো যে বিষয়টার কথা আমি গত এক বছর থেকে বলে আসছি, সেটা আরও একবার সবাইকে মনে করিয়ে দিই। আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা হয়েছিল। সেই ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হয়েছিল এবং কিছু দুর্বৃত্ত সেই প্রশ্নপত্র লাখ লাখ টাকায় বিক্রি করেছিল। ফাঁস করা সেই প্রশ্নপত্র ফ্যাক্স করে এ দেশের বিশেষ রাজনৈতিক দলের নিজস্ব কোচিং সেন্টারে সেন্টারে পাঠানো হয়েছিল। অনেক মা-বাবা তাঁদের সন্তানদের জন্য লাখ লাখ টাকা দিয়ে সেই প্রশ্নপত্র কিনেছেন। কোচিং সেন্টার সেই মা-বাবাদের ভাড়া করা

অ্যাপার্টমেন্টে রেখে বিরিয়ানির প্যাকেট খাইয়েছে। তাঁদের সন্তানেরা তখন রাত জেগে কোচিং সেন্টারে বসে বসে প্রশ্নপত্র মুখস্থ করেছে। ভর্তি পরীক্ষায় আসল পরীক্ষার্থীদের হটিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় এই ছেলেমেয়েরা ঢুকে পড়েছে। (আমার খুব জানার ইচ্ছে করে এই ছেলেমেয়েগুলো যখন তাদের মা কিংবা বাবার চোখের দিকে তাকায় তখন তাদের ভেতর কী ভাবনা খেলা করে।) ব্যাপারটা এত স্পষ্ট ছিল যে সেটা নিয়ে মামলা হয়েছে। প্রতারিত পরীক্ষার্থীরা আন্দোলন করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি! দুর্বৃত্তদের থেকে টাকা দিয়ে প্রশ্নপত্র কিনে দুর্বৃত্ত মা-বাবাদের দুর্বৃত্ত সন্তানেরা এ দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। তারা হয়তো একদিন পাস করে বের হয়ে চিকিৎসকও হবে। এই চিকিৎসকদের দিয়ে আমরা কী করব? মানুষ দূরে থাকুক, তাদের কি পশুদের চিকিৎসা করারও যোগ্যতা কিংবা অধিকার আছে?

আমাদের দেশের হর্তাকর্তা বিধাতারাও আমার মতোই তাঁদের ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে যাচ্ছেন। উঠতে-বসতে তাঁরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামের কথা বলে যাচ্ছেন। মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে লাখ লাখ টাকায় বিক্রি করা কি দুর্নীতি ছিল না? তিন কোটি টাকার মামলায় শেখ হাসিনাকে ধরা হয়েছে, এখানে তো তিন কোটি থেকে বেশি টাকা লেনদেন হয়েছে, এখানে কাউকে ধরা হলো না কেন? একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর পরও কেন এত বড় দুর্নীতি বন্ধ করা হলো না? যারা এটা করেছে কেন তাদের কোমরে দড়ি বেঁধে হাজতে নেওয়া হলো না? জামায়াতে ইসলামীর কোচিং সেন্টারগুলো যুক্ত আছে বলেই কি এটা ধামাচাপা দেওয়া হলো? নাকি এর পেছনে অন্য কোনো রহস্য আছে, যেটা আমাদের জানার কথা নয়?

এ ঘটনাটি যে ভয়ঙ্কর রকম হৃদয়বিদারক, তার অন্য একটি কারণ আছে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজ শেষ করে এই ভর্তি পরীক্ষাগুলো দিয়ে তাদের নিজেদের সত্যিকার জীবন শুরু করে। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পূর্বশর্ত হচ্ছে এ ভর্তি পরীক্ষাগুলো। ছেলেমেয়েরা যখন দেখে তারা মেধাবী, তারা সারা জীবন মন দিয়ে লেখাপড়া করেছে, পরিশ্রম করেছে, তারা জীবনে কোনো অন্যায় করেনি, কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় সুযোগগুলোয় তাদের হটিয়ে সেখানে ঢুকে যাচ্ছে দুর্বৃত্ত মা-বাবার দুর্বৃত্ত সন্তানেরা, তখন তারা হতবাক হয়ে যায়। যখন তারা দেখে তাদের প্রতিবাদের কথাটুকু কেউ শোনে না, চোখে আঙুল দিয়ে

দেখানোর পরও এ দেশের রাষ্ট্রযন্ত্র সেই অর্থলোলুপ ক্ষমতাশালী দুর্বৃত্তদের স্পর্শ করে না, তখন তাদের বুকটি ভেঙে যায়। জীবনটা শুরু করার আগেই সবকিছু একটা কুৎসিৎ রূপ নিয়ে তাদের চোখের সামনে দেখা দেয়, তাদের স্বপ্ন দেখার আর কিছু থাকে না। অন্যদের কথা জানি না, আমি যখন এ দেশের বড় বড় উপদেষ্টা, সরকার ও দুর্নীতি দমন কমিশনের বড় বড় ব্যক্তিদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে গালভরা কথা বলতে শুনি, তখন এক ধরনের জ্বালা অনুভব করি।

এতটুকু ছিল ভূমিকা, এবারে আসল কথাটুকু বলি। আসছে ২৬ অক্টোবর মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা। যেহেতু আগের বার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে আক্ষরিক অর্থে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করা হয়েছে, যারা সেটি করেছে তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করা হয়নি, তাই আমরা মোটামুটি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, এবারেও সেটি ঘটতে যাচ্ছে। অভিভাবকেরা আমাকে জানিয়েছেন তাঁদের কাছে ফোন করে জানানো হয়েছে কয়েক লাখ টাকার বিনিময়ে তাঁদের হাতে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তুলে দেওয়া হবে। যেহেতু আগের বার সবকিছু জানার পরও কিছু হয়নি, আমি ধরে নিচ্ছি, এবারেও কিছু করা হবে না। এ দেশের সাধারণ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে কারও কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু সে জন্য আমরা নিশ্চয়ই চুপচাপ বসে থাকব না, ভাঙা রেকর্ডের মতো চিৎকার করতেই থাকব। স্কুল-কলেজ শেষ করা একটি ছেলে বা মেয়ে যখন কিছুদিন পর আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলবে, এখানে এত বড় একটা দুর্নীতি করে আমার পুরো জীবনের স্বপ্ন আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হলো, আপনারা কিছুই করতে পারলেন না? তখন আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্তত মাটির দিকে তাকিয়ে বলতে পারব, "আমি কিন্তু চেষ্টা করেছিলাম।"

২

আমাদের দেশের লেখাপড়ার ব্যাপারে সবচেয়ে ভয়ের কথাটা কী সেটা কেউ বলতে পারবে? আমার ধারণা, বেশির ভাগ মানুষই সেটা বলতে পারবে না। সেটা হচ্ছে এই দেশের ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে আর পড়তে চাইছে না। এ দেশে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব দ্রুত কমে আসছে। বিচ্ছিন্নভাবে এক-দুইবার এই ব্যাপারটা খবরের কাগজে এসেছে, কিন্তু সেটা যে একটা বন্যা বা সুনামির মতো প্রলয়ঙ্করী ব্যাপার, সেটা কিন্তু সেভাবে আসেনি। দেশের যেসব

শিক্ষাবিদ এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, তাঁরা বিষয়টা জানেন, কিছু সাংবাদিকও জানেন। কিন্তু দেশের যাঁরা দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন, দেশের জন্য নীতিনির্ধারণ করবেন, তাঁরা বিষয়টা জানেন বলে মনে হয় না। তাঁদের কথাবার্তা, কাজকর্মে কোথাও এই ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো চিহ্ন আমাদের চোখে পড়েনি।

আমরা সবাই জানি একটা দেশকে গড়ে তোলার একটিই উপায়, সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি। ভালো করে চাষ করতে হলেও বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির দরকার, গার্মেন্টসে ভালো করে জামা বানাতেও বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির দরকার, কুসংস্কার আর ধর্মান্ধতা থেকে দেশকে মুক্তি দিতেও বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির দরকার। একটা দেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কি না, সেটা বোঝার একটা সহজ উপায় হচ্ছে সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে তাকানো। যে দেশ যত দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, দেখা যাবে সেই দেশের ছেলেমেয়েরা তত বেশি বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি পড়ছে। আমরা যদি মাধ্যমিক আর উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার সুযোগ করে দিতে না পারি, তাহলে সেটা হবে খুব দুঃখের কথা। কিন্তু যদি দেখি যেটুকু সুযোগ আছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা সেই সুযোগটাও নিচ্ছে না, তাহলে সেটা হবে একটা ভয়াবহ আতঙ্কের কথা। এ মুহূর্তে আমরা কিন্তু সেই আতঙ্কের মধ্যে আছি।

কেন এমন হচ্ছে, আমাদের সেটা খুঁজে বের করতে হবে। সাধারণভাবে শুধু কমনসেন্স দিয়ে আমরা কয়েকটা কারণ অনুমান করতে পারি। প্রথম কারণটা নিশ্চয়ই পাস করে চাকরি পাওয়ার ব্যাপারটুকু। লেখাপড়া করে জ্ঞান অর্জন করে মানুষ হওয়ার পাশাপাশি সবাই চায় ভালো একটা চাকরি পেয়ে জীবনের একটা নিশ্চয়তা হোক। ভবিষ্যতের সুন্দর-সচ্ছল একটা জীবনের স্বপ্ন সবাই দেখে। কোনো একটা কারণে এ দেশের ছেলেমেয়েদের ধারণা হয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রাজুয়েট হওয়ার থেকেও অন্য শর্টকাট পথ রয়েছে। এ দেশের ঝকঝকে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করা চকচকে ম্যানেজারদের দেখে তাদের সম্ভবত এই ধারণা হয়েছে।

দ্বিতীয় একটি কারণ সম্ভবত আমাদের দেশের বিজ্ঞান পড়ার ব্যাপারটি। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটি এখন সর্বনিম্ন অবস্থায় আছে। প্রতিবছর এসএসসি আর এইচএসসি পরীক্ষার পর গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ পাওয়া ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরা এক ধরনের উচ্ছ্বাস দেখাই; কেউ যদি খোঁজ

নিয়ে দেখে তাহলে আবিষ্কার করবে এ ছেলেমেয়েগুলোর বেশির ভাগ সময় কেটেছে মুখস্থ করে। একদিকে আমরা মুখস্থের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি অন্যদিকে শিক্ষাব্যবস্থা ভালো মার্কসের জন্য ছাত্রছাত্রীদের মুখস্থ করতে বাধ্য করছে। বিজ্ঞান জানা কিংবা বোঝায় যতটুকু আনন্দ, সেটা মুখস্থ করায় ঠিক ততটুকু কষ্ট। কাজেই ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান না পড়ে যদি সেই কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাহলে কি তাদের দোষ দেওয়া যাবে?

বিজ্ঞান শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কমে যাওয়ার তৃতীয় কারণটি সম্ভবত ভালো বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব। বিজ্ঞানের যে বইগুলো লেখা আছে, সেগুলো ঠিক করে লেখা হয়নি। মূল ধারণাগুলো ভালো করে বোঝানোর পরিবর্তে সেখানে অসংখ্য তথ্য ঠেসে দেওয়া হয়েছে। তাই ভালো শিক্ষক না হলে তাঁরা ব্যাপারটা ভালো করে বোঝাতেও পারেন না, ছাত্রছাত্রীদের ভেতর বিজ্ঞান নিয়ে কোনো আগ্রহও তৈরি করতে পারেন না। আমার ধারণা, সম্ভবত খুব কম বিদ্যালয়ই আছে, যেখানে ভালো বিজ্ঞানের শিক্ষক আছেন। বিজ্ঞান থেকেও খারাপ অবস্থা গণিতের বেলায়, যেহেতু বিজ্ঞান আর গণিতকে হাতে হাত ধরে যেতে হয়, তাই বিজ্ঞান পড়ার আগ্রহ আরও কমে আসে গণিতের ভয়ে।

চতুর্থ কারণটি সম্ভবত একটু মন খারাপ করা কারণ। লেখাপড়ার পুরো ব্যাপারটিই এখন বাণিজ্যিক হয়ে গেছে, ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে যায় কিন্তু পড়ে প্রাইভেট টিউটরের কাছে। প্রচলিত বিশ্বাস হচ্ছে, বিজ্ঞান বা গণিত কঠিন, তাই এগুলো নিজে নিজে পড়ার মতো আত্মবিশ্বাস এখন খুব কম ছেলেমেয়েরই আছে। কাজেই এ দেশে এখন যাদের প্রাইভেট পড়ার মতো টাকা-পয়সা নেই, তারা বিজ্ঞান পড়ার কথা কল্পনাও করতে পারে না। আগে গ্রামেগঞ্জে ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান পড়ত, এখন দিন চালাতেই সব টাকা-পয়সা শেষ হয়ে যায়—প্রাইভেট পড়ানোর জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বিজ্ঞান পড়বে কেমন করে?

সম্ভবত আরও কারণ আছে, যেগুলো আমরা জানি না, খোঁজ নিলে সেগুলো বের হয়ে আসবে। ব্যাপারটা দেশের ভবিষ্যতের জন্য খুব ভয়ঙ্কর। এ মুহূর্তে দেশে এক ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার রয়েছে, সংবিধানে এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব ছিল তিন মাসের ভেতর নির্বাচন করা। কাজেই সেই সরকারের অন্য কিছু না করলেও ক্ষতি ছিল না। এ সরকার প্রায় দুই বছর থাকবে। দুই বছর অনেক সময়, কাজেই তাদের নির্বাচন ছাড়া অন্য সব বিষয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে হবে না। তাদের দেশের

অন্য অনেক বিষয়ে দায়দায়িত্ব নিতে হবে। আমার কাছে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিক্ষা, তাই এ শিক্ষার ব্যাপারেও তাদের কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দেশের ছেলেমেয়েরা কেন বিজ্ঞান পড়া ছেড়ে দিচ্ছে, সেটা খুঁজে বের করতে হবে, তাদের আবার বিজ্ঞান পড়ার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে। বিষয়টা খুব গুরুতর—এই দেশে যখন বন্যা, মঙ্গা বা ঘূর্ণিঝড় হয় তখন আমরা যে রকম সর্বশক্তি নিয়ে সেটা সমাধানের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ি, এটাও কিন্তু সে রকম।

৩

সবার নিশ্চয়ই মনে আছে, একটা সময় ছিল যখন সবাই বলত তথ্যপ্রযুক্তি দিয়ে এই দেশ অর্থনৈতিকভাবে মাথা উঁচু করে ফেলবে। এ দেশের সব ছেলেমেয়ে তখন পাগলের মতো কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে এসেছে। যে ছেলে গণিত বা বিজ্ঞান পড়ে বিশ্বনন্দিত গণিতবিদ বা বিজ্ঞানী হতে পারত, সেও এসেছে কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে। যে কারণেই হোক এ দেশে সফটওয়্যার কোম্পানি সেভাবে গড়ে ওঠেনি, মাঝখান থেকে মোবাইল ফোন কোম্পানিগুলো এসে রমরমা ব্যবসা করছে। তাদের ব্যবসা এমনই জমজমাট যে পত্রিকা বা টেলিভিশন খুললে এখন শুধু তাদের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। (ভিওআইপিতে দুর্নীতির জন্য তাদের কোনো কর্মকর্তার কিন্তু জেল হয় না, চোখের পলকে তারা দেড়-দুই শ কোটি টাকা জরিমানা দিয়ে দেয়!) মোবাইল ফোন কোম্পানিতে চাকরি করা এখন এই দেশের ছেলেমেয়েদের জীবনের লক্ষ্য, যারা একসময় কম্পিউটার সায়েন্স পড়েছে তারা এখন পাগলের মতো টেলিকম ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য ছুটছে।

অন্যদিকে তথ্যপ্রযুক্তি কিন্তু থেমে থাকেনি, সেটি নিজের মতো করে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশে কিংবা দেশের বাইরে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োজন একটুও কমেনি, বরং বেড়েছে। কিন্তু কম্পিউটর সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ হঠাৎ কমে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটা ভয়াবহ শূন্যতা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়গুলোয় ছাত্র ভর্তি কমে যাওয়ার কারণে যে সমস্যাটি তৈরি হবে, সেটা আমরা টের পাব আজ থেকে কয়েক বছর পর। মোটামুটিভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, এই ব্যাপারে যদি কিছু করা না হয় তাহলে আজ থেকে কয়েক বছর পর ভারত থেকে প্রযুক্তিবিদ এনে আমাদের কাজগুলো করাতে হবে। আমরা আমাদের জনশক্তিটা তৈরি করার আগেই সেটা শেষ করে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছি।

এটা এক ধরনের ক্রান্তিকাল। এ দেশের সফটওয়্যার শিল্পের কর্ণধারেরা সত্যিই যদি মনে করেন এই দেশে শিল্পটি এখন গড়ে উঠতে শুরু করেছে, তাঁরা যদি মনে করেন তাঁদের বিশাল একটা জনশক্তির দরকার, তাহলে দেশের মানুষকে সেটা বলতে হবে। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করতে হবে, এটা নিয়ে সেমিনার-ওয়ার্কশপ করতে হবে। দেশের প্রাইভেট আর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তাঁরা যদি সেটা না করেন, তাহলে আজ থেকে কয়েক বছর পর আমাদের মাথা চাপড়ানো ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না।

এ সর্বনাশটি ঘটতে যাচ্ছে, কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সরকার এখন পর্যন্ত একটা সুতাও নাড়ায়নি। (একমুখী শিক্ষা বাতিল হয়েছে, এটা মনে হয় এ সরকার জানে না, কারণ একমুখী শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে যে পরের কাজকর্মগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। একতলা শেষ না করে দোতলা শুরু করার মতো!) এ সরকারের শিক্ষা নিয়ে কাজকর্ম যেটুকু দেখেছি, তাতে আমি এখন পুরোপুরি আশা ছেড়ে দিয়েছি। দেশের উচ্চশিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জোট সরকারের হাতের পুতুল দিয়ে চালানো হচ্ছে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তাই এ সরকার দেশের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে প্রয়োজনীয় জনশক্তি তৈরি করার জন্য একটা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হবে, আমি সেটা এখন আর আশা করি না।

আমি তাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছি ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনের জন্য। সত্যিই যদি একটা নির্বাচন হয় তখন একটা রাজনৈতিক সরকার আসবে, সেই সরকারের নিশ্চয়ই মেরুদণ্ডে জোর থাকবে, তখন হয়তো তারা ভালো কিছু সিদ্ধান্ত নেবে, সাহসী কিছু সিদ্ধান্ত নেবে শিক্ষাটাকে ঠিক করার জন্য।

অন্তত আমরা তো তখন সে জন্য চেঁচামেচি করতে পারব, জরুরি অবস্থার ভয় দেখিয়ে কেউ আমাদের মুখ বন্ধ রাখতে পারবে না, কোনো পত্রিকাও সেটা না ছাপিয়ে আমাদের হতাশ করতে পারবে না।

ভবিষ্যতে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, এ স্বপ্ন যদি না দেখি, তাহলে বেঁচে থাকব কী নিয়ে?

প্রথম আলো
২৩ অক্টোবর ২০০৭

ঘৃণা থেকে মুক্তি চাই

প্রায় বছর ত্রিশেক আগে আমি যখন আমেরিকায় পি.এইচ.ডি করছি তখন স্টীভ মোজলে নামে আমার একজন আমেরিকান বন্ধু কলেরা হাসপাতালে কাজ করতে এসেছিল। এখানে কয়েক মাস কাজ করে সে যখন আমেরিকা ফিরে গিয়েছে তখন একদিন আমাকে বলেছিল, "উনিশ শ একাত্তর সালে তোমাদের বাংলাদেশে যা ঘটেছে সেটা এতো অবিশ্বাস্য রকমের নিষ্ঠুর যে আজ থেকে দশ বিশ বছর পর সেটা আর কেউ বিশ্বাস করবে না।" তার কথার গুরুত্ব আমি তখন ধরতে পারিনি, এখন পারছি। সত্যি সত্যি একাত্তরে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তাদের আজ্ঞাবহ অনুচরদের নিয়ে এই দেশে কী করেছিল সেটি বললে সভ্য জগতের মানুষেরা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকায়। বাইরের মানুষের কথা ছেড়ে দিই, এই দেশের নূতন প্রজন্ম পর্যন্ত পাকিস্তান নামক দেশটিকে জানে একটি ক্রিকেট টিমের দেশ হিসেবে, মোবাইল কোম্পানীর বড় কর্মকর্তার দেশ হিসেবে। আমরা—শুধু আমরা, যারা সেই একাত্তরকে নিজের চোখে দেখেছি তারা জানি সেটি কী ভয়ংকর ধরনের নিষ্ঠুরতা ছিল, কী অবিশ্বাস্য নৃশংসতা ছিল। এই দেশের সাতকোটি মানুষের একজনও ছিল না যারা তার কোনো একজন আপনজনকে হারায় নি। সাতকোটি মানুষের ভেতর এককোটি মানুষকে দিয়ে যদি শুধুমাত্র প্রাণ বাঁচানোর জন্যে অন্য দেশে শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নিতে হয় তাহলেই বিষয়টা কতোটুকু ভয়ংকর ছিল, যে কেউ অনুমান করতে পারবে। যদি তারা শরণার্থী হয়ে পালিয়ে না যেতো তাহলে যে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আর তাদের আজ্ঞাবহ অনুচরেরা তাদের প্রত্যেককে হত্যা করতো সেটা কী সবাই জানে?

আমরা যারা একাত্তরকে নিজের চোখে দেখেছি শুধু তারাই জানি ঘৃণা কাকে বলে। এই পৃথিবীতে খুব বেশি মানুষ নেই যারা আমাদের মতো করে সেই ঘৃণাকে অনুভব করতে পারবে। এই ঘৃণা শুধুমাত্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্যে নয়, এই ঘৃণা শতগুণে বেশি একাত্তরের রাজাকার

আলবদর আল শামসদের জন্যে—যার বেশীর ভাগ ছিল জামায়াতে ইসলামীর সদস্য। আমার কাছে কেউ যখন জানতে চায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার জন্যে তারা কোন বই পড়বে আমি তখন তাদের শুরু করার জন্যে যে চারটি বইয়ের নাম বলি তার একটি হচ্ছে পাকিস্তানী মেজর সিদ্দিক সালিকের লেখা "উইটনেস টু সারেন্ডার" বইটি। সেই বইয়ের এক জায়গায় লেখা আছে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা সরাসরি মিলিটারী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ করেছিল যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে কাজ করার জন্যে রাজাকার আলবদর আল শামস নামে যে আধা সামরিক বাহিনী তৈরি করেছে সেটা আসলে জামায়েতে ইসলামেরই বাহিনী। সেই একাত্তরেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীই তখন নির্দেশ দিয়েছিল ব্যাপারটা যেন এতো খোলামেলাভাবে প্রকাশ না পেয়ে যায়।

সেই জামায়েতে ইসলামীর বদর বাহিনীর কমান্ডার এখন বলছে এই দেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নেই? রক্তস্নাত এই দেশে সেই মানুষগুলো এতো বড় দুঃসাহস কোথা থেকে পায়?

২

১৯৭১ সালে দেশোদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের নিয়ে যে আধা সামরিক বাহিনীগুলি তৈরি করা হয়েছিল তার মাঝে রাজাকার বাহিনী ছিল সমাজের একেবারে নিচু শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে তৈরি। সেই একাত্তরেও পাকিস্তান সেনা বাহিনীর এতো হম্বিতম্বির পরেও কোনো আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয় নি। যারা যোগ দিয়েছিল তারা ছিল ভীতু এবং কাপুরুষ। একজন মুক্তিযোদ্ধা এক দুইজন নয়, একসাথে এক দুই শত রাজাকারকে বন্দী করে ফেলতে পারতো। সেই তুলনায় বদর বাহিনী ছিল অনেক ভয়ংকর তার কারণ এই বাহিনীর সদস্য ছিল জামায়েতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্যরা। একজন সাধারণ মানুষ যত বড় অপরাধীই হোক অন্য একজন মানুষকে হত্যা করতে ইতস্তত করে, অপরাধবোধে ভুগে কিন্তু এই বদর বাহিনী ইতস্তত করতনা, তাদের ভেতর কোনো অপরাধবোধ ছিল না, কারণ তারা হত্যাযজ্ঞ চালাতো ইসলামের নামে, পাকিস্তানের নামে। একাত্তরে মতিউর রহমান নিজামী, পাকিস্তান বদর বাহিনীর কমান্ডারের দেয়া এক দুইটি "বাণী" পড়লেই সেটা বোঝা যায়। যেমন যশোরে রাজাকার বাহিনীর সভায় বলা হয়েছিল "আমাদের প্রত্যেককে একটা ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমান সৈনিক হিসাবে পরিচিত হওয়া

উচিৎ এবং মজলুমকে আমাদের প্রতি আস্থা রাখার মতো ব্যবহার করে তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে ঐ সকল ব্যক্তিকে খতম করতে হবে যারা সশস্ত্র অবস্থায় পাকিস্তান ও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত আছে!" (প্রথম আলো ৩০ অক্টোবর ২০০৭) তারা সবাই মিলে এই দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের "খতম" করেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন আবিষ্কার করেছে সত্যিই এই দেশটি স্বাধীন হতে যাচ্ছে তখন যেন এই দেশটি মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সে জন্যে এই দেশের বুদ্ধিজীবীদের "খতম" করেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের এতো বছর পরেও সেটি নিয়ে তাদের ভেতরে কোনো অনুশোচনা নেই, কোনো অপরাধবোধ নেই। এখন দেখছি তাদের ভেতরে এক ধরনের অহংকার আছে! পূর্ব পাকিস্তান বদর বাহিনীর কমান্ডার আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, এই দেশে কোনো স্বাধীনতাবিরোধী নেই, ছিল না!

কেমন করে এটা ঘটেছে আমরা সেটা খানিকটা জানি খানিকটা অনুমান করতে পারি। ১৯৯৪ সালে দেশে ফিরে এসে আমি শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছি, কিছুদিনের ভিতরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে একটা তদন্ত কাজে লাগিয়ে দিল। ছাত্রদলের ছেলেরা তখন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের তেজস্বী কণ্ঠস্বর তারা কোনো একটা অনুষ্ঠানে রাজাকারদের গালাগাল করেছে, ইসলামী ছাত্র শিবিরের একজন ছাত্র তখন একজন ছাত্র নেতাকে চাকু মেরে দিয়েছে। আমি আমাদের তদন্ত কমিটি নিয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছি সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে শিবিরের ছেলেটিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

তারপর এই দেশে খুব বিচিত্র একটা ব্যাপার ঘটলো। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাজাকারদের বিপক্ষে কথা বলার জন্যে যে তেজস্বী ছাত্রটি চাকু খেয়েছিল তার রাজনৈতিক দল বি.এন.পি ইলেকশানে জেতার জন্যে জামায়েতে ইসলামীর সাথে একটা জোট করল। আমি খবরটি একবার দুইবার একশবার পড়েও বুঝতে পারি না, যে জিয়াউর রহমান এই দেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার তার হাতে তৈরি দল স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতে ইসলামীর সাথে জোট করেছে? সেটা কীভাবে সম্ভব? ইলেকশানে জেতা কী এতোই জরুরি? আদর্শ বলে কিছু নেই? দেশের জন্যে মমতা বলে কিছু নেই?

এরকম সময়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নামকরণ নিয়ে এক ধরনের উত্তেজনা। একদিন আমি সবিস্ময়ে দেখি ছাত্রদলের চাকু খাওয়া সেই

ছেলেটি ইসলামী ছাত্র শিবিরের ছাত্রদের পাশে দাঁড়িয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছে। বক্তৃতার বিষয় অত্যন্ত সহজ এবং সরল, আমাকে কুৎসিত গালাগাল। আমি নিজের কানে শুনছি অবিশ্বাস করি কীভাবে?

আমাদের দেশে যেটা ঘটেছিল সারা দেশে সেটা ঘটতে লাগলো। মুক্তিযোদ্ধা মান্নান ভূইয়া বদর বাহিনীর কমান্ডার মতিউর রহমান নিজামী আর আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের পাশে বসে দেশ শাসন করতে লাগলেন। আমি রাজনীতি বুঝি না, রাজনৈতিক বিশ্লেষকও না, কিন্তু আমি উনিশ শ একাত্তর সালের জামায়াতে ইসলামীকে দেখেছি তাই আমি জানি এই দলটি কী! আমি খবরের কাগজে একদিন লিখেছিলাম, জামায়াতে ইসলামী একদিন বি.এন.পি.-এর হাড় মাংস মজ্জা শুষে খেয়ে তার চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবে।

বি.এন.পি.-এর হর্তাকর্তারা কি সেই ডুগডুগির আওয়াজ শুনছেন?

৩

তবুও হিসাব মিলতে চায় না। জামায়াতে ইসলামীকে নিয়ে বি.এন.পি. যেভাবে দেশ শাসন করেছে সেটা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কময় দেশ শাসন। শুধু যে লুটপাট এবং লুণ্ঠন তা নয়, জঙ্গী বাহিনীকে সারা দেশে পাকাপোক্তভাবে শিকড় গেড়ে বসিয়ে দেয়া দেশের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে নিজেদের মানুষ বসিয়ে দেয়ার কাজটিও তারা ভালভাবে শেষ করেছে। কিন্তু সেই পাঁচ বছরের শাসন আমলেও বদর বাহিনীর কমান্ডার আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদের মুখ থেকে যে কথাগুলো বের হয় নি, এখন কেন সেগুলো বের হচ্ছে? প্রকাশ্য টেলিভিশনে প্রাক্তন সচিবের মুখ দিয়ে সেগুলো কেমন করে সমর্থিত হচ্ছে? এই সময়টা কী বিশেষ একটা সময়?

আমার তখন মনের মাঝে এক ধরনের শংকা কাজ করে। গোয়েন্দা বাহিনী থেকে এই দেশের সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেলে একটা কাগজ পাঠানো হয়েছে সেখানে এই দেশের বিশেষ এক ধরনের বুদ্ধিজীবী আর তাদের টেলিফোন নম্বর দেয়া আছে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যখন কোনো টক শো করবে তখন অবশ্যই এই তালিকা থেকে একজন বুদ্ধিজীবীকে রাখতে হবে। সেই বুদ্ধিজীবীর তালিকা দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে, সাহস করে কোনো একটা পত্রিকা যদি সেই তালিকা প্রকাশ করতো তাহলে দেশের মানুষেরও আক্কেল গুড়ুম হয়ে

যেতো। এর বড় অংশ হচ্ছে উগ্র ডানপন্থী, যদি এটাই এই দেশের বর্তমান রাষ্ট্রক্ষমতার মতাদর্শ হয়ে থাকে তাহলে অনুমান করতে সমস্যা হয় না শাহ হান্নান বা মুজাহিদের ঔদ্ধত্যের শক্তিটুকু কোথায়।

তবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের উপর আমার বিশ্বাস আছে। এই মানুষগুলোর ধৈর্য্য ধরার ক্ষমতা অসাধারণ কিন্তু যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখন অবস্থার পরিবর্তন করে। মাইনাস টু, প্লাস ওয়ান, সিল দেওয়া সংস্কার, ষড়যন্ত্র থিওরি এই বিষয়গুলো কেউ বুঝিয়ে দেওয়ার আগেই তারা বুঝে ফেলে। বদর বাহিনীর কমান্ডার আলী আহসান মুজাহিদের এবারকার বক্তব্যটি এই দেশের মানুষের কাঁচা নার্ভকে স্পর্শ করেছে। যখন টেলিভিশনে এটা প্রচার করা হয়েছে তখনই আমার কাছে অসংখ্য টেলিফোন এস.এম.এস. এসেছে সেটা দেখার জন্যে। এই দেশের বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী বদর বাহিনীকে আমি এতো ঘৃণা করি যে তাদের যেন দেখতে না হয় সে জন্যে আমি টেলিভিশনের কাছে পর্যন্ত যাই না। আমি জানি আমি একা নই—এই দুঃখী দেশটার জন্ম প্রক্রিয়া যারা দেখেছে তাদের কারো পক্ষে এই মানুষগুলোর চেহারা দেখা সম্ভব নয়।

মনে হচ্ছে দেশের মানুষের হঠাৎ করে এক ধরনের আত্মোপলব্ধি হয়েছে, সবাই ভাবছে এ কী হলো? যে মানুষগুলো এই দেশের স্বাধীনতাই চায় নি, যারা এই দেশের সোনার ছেলেদের আক্ষরিক অর্থে জবাই করেছে তারা দাবী করছে এই দেশে কোনো যুদ্ধাপরাধ হয় নি? এই দেশে কোনো জেনোসাইড হয় নি? যে তথ্যগুলো আমাদের প্রজন্ম নিজের চোখে দেখে এসেছে গত কয়েকদিন থেকে সেই তথ্যগুলো খবরের কাগজে আসতে শুরু করেছে। একাত্তরের পরের প্রজন্ম দেখতে শুরু করেছে পাকিস্তানের নামে আর ইসলামের নামে এই দেশে কতো বড় নৃশংসতা করা হয়েছে। তারা কী নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারবে?

৪

আমার জানা মতে কোনো একটি ঘটনা দিয়ে এই দেশের এতো মানুষের এতো বড় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া আমি আগে কখনো দেখি নি। কিছুদিন আগে এই জামায়াতে ইসলামীর পত্রিকায় লাউ নিয়ে একটা কার্টুন বের হয়েছিল। সেই একই কার্টুনটা প্রকাশিত হয়েছিল প্রথম আলোয় আলপিনে, সেখানে শুধু লাউয়ের জাগায় বদলে দেয়া হয়েছিল বিড়াল দিয়ে। দেশের মানুষের ধর্মবোধকে আঘাত করা হয়েছে সেই অপরাধে কার্টুনিস্টকে যদি গ্রেপ্তার করা

যায় তাহলে দেশের মানুষের দেশপ্রেম বোধকে আঘাত করা হয়েছে সেই অপরাধে কেন মুজাহিদ বা হান্নানকে গ্রেপ্তার করা যায় না?

জামায়াতে ইসলামীর পত্রিকায় প্রকাশিত কার্টুনের কার্টুনিস্টকে যদি গ্রেপ্তার করা না হয়ে থাকে তাহলে হুবহু একই কার্টুনের জন্যে আলপিনের কার্টুনিস্টকে কেন গ্রেপ্তার করা হল? তাকে কেন ছেড়ে দেয়া হচ্ছে না?

৫

ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখ নিউইয়র্কের কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে (Kean University) বাংলাদেশের জেনোসাইডের উপর একটা সেমিনার হতে যাচ্ছে। এই সেমিনারটির জন্যে খাটা খাটুনি করছে নূতন প্রজন্মের কিছু তরুণ। আমার জানামতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাংলাদেশের জেনোসাইড নিয়ে একটি সেমিনার এই প্রথম। সেমিনারে আলোচ্য বিষয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গণহত্যার পাশাপাশি এই দেশের বুদ্ধিজীবী হত্যার কথাগুলো উঠে আসবে। সেনাবাহিনীর আজ্ঞাবহ রাজনৈতিক দল, তাদের তৈরি আধা সামরিক বাহিনী এবং সেই বাহিনী প্রধানদের নাম হিসেবে গোলাম আযম-নিজামী-মুজাহিদের নামও ওঠে আসবে। সেই নামগুলো আনুষ্ঠানিক ভাবে লিপিবদ্ধ হবে, সেমিনারের পঠিত প্রবন্ধ হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী থেকে সারা পৃথিবীর তথ্য সম্ভারে সারা জীবনের জন্যে সংরক্ষিত হয়ে যাবে। আমরা যখন বেঁচে থাকব না, তখনো আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সেই আনুষ্ঠানিক তথ্যের রেফারেন্স যুগ যুগ ধরে ব্যবহার করতে পারবে। বাংলাদেশের সত্যিকারের ইতিহাস রক্ষার জন্যে এটি খুব বড় একটি উদ্যোক্তা, উদ্যোক্তাদের জন্যে রইল শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা।

৬

খবরের কাগজে দেখেছি আমাদের বিজয়ের মাসে ডিসেম্বরের ৩ তারিখ মুক্তিযোদ্ধা মহাসমাবেশ হবে। এই দেশের নূতন প্রজন্ম যদি দেশকে ভালবাসতে চায় তাহলে তাদেরকে দেশের গৌরবোজ্জল ইতিহাসটুকু জানতে হবে। এই দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের মতো গৌরবের বিষয় আর কী হতে পারে? আমরা তাই দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনানোর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। সেই অনুষ্ঠানে আমরা যখন যে মুক্তিযোদ্ধাকে অনুরোধ করেছি তারা তাদের শত ব্যস্ততার মাঝেও সময়

দিয়ে ছোট বাচ্চাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলে আমি আবিষ্কার করেছি তাদের অনেকের বুকের ভেতর এক ধরনের অভিমান রয়ে গেছে। যে দেশকে রক্ত দিয়ে স্বাধীন করেছেন সেই দেশে যুদ্ধাপরাধী গাড়িতে পতাকা উড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়, তারা যদি অভিমান না করেন তাহলে কারা করবে?

আমার খুব ভাল লাগছে যে এবারে এই দেশের মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অভিমানের কথা ভুলে গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছেন। সকল সেক্টর কমান্ডাররা বলছেন, অনেক হয়েছে। আর নয়। তারা এই দেশকে জঞ্জালমুক্ত করবেন। এই দেশের অবস্থা এমন হয়েছে যে সত্যি কথাটিও কেউ বলতে পারে না, তার মাঝে একটা রাজনীতির গন্ধ খুঁজে বের করে সত্য কথাটিরও ভুল অর্থ করে ফেলা হয়। মুক্তিযুদ্ধের বীর সেক্টর কমান্ডারদের সেই ভয় নেই, তারা এই দেশের সবচাইতে সম্মানী মানুষ, তাদের নেতৃত্বে এই দেশে স্বাধীনতার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রাম হয়েছে। তাদের মুখের কথা এই দেশের মানুষ বিশ্বাস করে। আমরা সবাই চাই তারা আবার আমাদের একটুকু নেতৃত্ব দিন, এই দেশের ইতিহাস অনেক গৌরবের, কলংকের অংশটুকু অপসারণ করার দায়িত্বটুকু তারা গ্রহণ করুন। তাদের সাথে এই দেশের সকল মানুষ আছেন, থাকবেন। নির্বাচন কমিশন থেকেও বলা হয়েছে তারাও নীতিগতভাবে মনে করেন যুদ্ধাপরাধীদের এই দেশে নির্বাচনের অধিকার নেই। সারা দেশের মানুষের মাঝে এক ধরনের আত্মোপলব্ধি, এক ধরনের জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে পরাস্ত করার যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল। স্বাধীনতার তিন যুগ পর তারা দ্বিতীয়বার স্বাধীনতার শত্রুদের পরাস্ত করার নেতৃত্বটুকু নেবেন, আমরা সবাই সেটুকু আশা করি। তাদের পাশে থাকার জন্যে এই দেশের সকল ছাত্র শিক্ষক জনতা প্রস্তুত হয়ে আছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করলে আমরা যেন এই দেশের মানুষের ত্যাগ বীরত্ব আর অর্জনের কথা মনে করার আনন্দটুকু অর্জন করবে পারি। স্বাধীনতা বিরোধীদের নৃশংসতার কথা মনে করে আমরা আর ঘৃণা ক্রোধ আর ক্ষোভ অনুভব করতে চাই না—সেটুকু একবারের মতো আমরা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চাই।

এ রক্তস্নাত দেশের রক্তের ঋণ আমরা চিরতরে শোধ করে দিতে চাই।

প্রথম আলোতে খানিকটা পরিবর্তিত ভাবে প্রকাশিত

শিক্ষক পরিবার : এখন দুঃসময়

আমাদের চারজন শিক্ষককে দু বছরের জেল দেয়া হয়েছে। যখন বিচার চলছিল আমরা সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে সেটা লক্ষ্য করেছি। আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তার বাইরে একজন সাক্ষীও তাদের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেন নি তারপরেও তাদের দুই বছরের জেল হয়েছে। তাদের অপরাধ জরুরি অবস্থায় তারা মৌন মিছিল করেছিলেন। বিচার বিভাগ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা সবাই ভেবেছিলাম এখন বুঝি বিচারকেরা স্বাধীনভাবে বিচার করবেন—আমাদের বিশ্বাসে চোট খেতে গেলো। একটি কারণে নয় নানা কারণে!

সবার নিশ্চয়ই মনে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঘটনাটির পর সরকার নিজেই তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছিল। যে ঘটনায় স্বয়ং সরকার নিজে দুঃখ প্রকাশ করে তার জন্যে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা মৌন মিছিল বের না করে তাহলে কে বের করবে? আমরা কী সবসময়েই আশা করি না যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তাদের মতামতটুকু জানাবেন? সারা পৃথিবীতেই কী এটা ঘটে না? তাই খুব সঙ্গত কারণেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সেই দুঃখজনক ঘটনাটির প্রতিবাদে মৌন মিছিল করেছিলেন।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও আমরা মৌন মিছিল করেছিলাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অভিযুক্ত প্রমাণ করতে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের কালোঘাম ছুটে গিয়েছিল। সে তুলনায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌন মিছিলটিকে প্রমাণ করা খুব সহজ ছিল। পরদিন ডেইলি স্টারে বিশাল ছবি ছাপা হয়েছিল। এ.টি.এন. চ্যানেলে আমাদেরকে দেখানো হয়েছিল। সি.এস.বি. নামে যে চ্যানেলটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সেখান থেকে আমার বিবৃতি প্রচার করা হয়েছিল! আমি খুব বিভ্রান্তির মাঝে আছি, যে কাজটি করার পর আমি দিব্যি ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি সেই একই কাজ করে আমার মতো চারজন শিক্ষকের কেন দুই বছর করে জেল হয়ে

গেল? হয় তাদের ছেড়ে দিতে হবে যেন তারা আমার মতো ঘুরে ফিরে বের হতে পারেন—তা না হলে আমাকেও এই সরকারের জেলে ঢোকাতে হবে! (আমার জেলে যেতে কোনো আপত্তি নেই—এই দেশের জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জান দিয়ে দিতে পারে আমরা দুই চার বছর জেল খাটতে পারব না?)

কার কাছে আমার এই অভিযোগটা জানাব বুঝতে পারছি না। যে কাজটি করে আমার কিছু হয় নি—আমার সহকর্মী কেন সেই কাজ করে জেলে খাটবেন? কেউ কী বুঝিয়ে দেবেন।

আমার সহকর্মী শিক্ষকদের শেষ পর্যন্ত কী হবে জানি না। যদি কোনোভাবে তাদের কাছে খবর পৌছানো যেতো তাহলে আমি তাদের বলতাম, এই দেশের সব শিক্ষক মিলে আমরা একটি পরিবার। এই শিক্ষকেরা এর আগেও নৈতিক অবস্থান থেকে অনেক জেল জুলুম সহ্য করেছে—এখনো আবার করছে (যদিও আমার ধারণা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে এটি আর হবে না!) আমরা ছাত্র ও শিক্ষক এখন সরকারের প্রতিপক্ষ—শিক্ষকদের এই দুঃসময়ে আমরা—শিক্ষকের পরিবার একসাথে আছি—একসাথে থাকব।

প্রথম আলো
৭ ডিসেম্বর ২০০৭

ফিরে দেখা

ডিসেম্বর মাসটা একটু অন্য রকম। আমরা যারা সত্যিকারের বিজয় দিবসটা দেখেছিলাম, এই মাসে সেই ঐতিহাসিক এবং প্রায় অলৌকিক সেই দিনটির কথা ঘুরে-ফিরে বারবার আমাদের মনে পড়বেই। কী তীব্র ছিল সেই আনন্দের অনুভূতি! আমার মনে হয়, আমরা বুঝি পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান জাতিগুলোর একটি। একজন মানুষ তার জীবদ্দশায় এ রকম তীব্র আনন্দ আর কোনোভাবে কি অনুভব করতে পারে?

ডিসেম্বর মাসটা একটু অন্য রকম। কারণ, এই মাসে মন্ত্রী না হয়েও গাড়িতে পতাকা লাগানো যায়। আমাদের দেশের মন্ত্রীরা অবশ্য খুব অনুকরণীয় চরিত্র নন, তাঁদের অনেকেই এখন কারাগারে। আদর্শিক কোনো কারণে নয়, টাকা-পয়সা চুরির অভিযোগে। যাঁরা গাড়িতে জাতীয় পতাকা লাগান, তাঁরা সেটি করেন নিজের দেশের জন্য এক ধরনের মমতা থেকে, এই পতাকার জন্য যত মানুষ আত্মত্যাগ করেছে, বুকের রক্ত দিয়েছে, পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশে তত মানুষই নেই!

ডিসেম্বর মাসটা একটা অন্য রকম। তার কারণ, এই মাসটাতে শুধু যে বিজয় দিবস আছে তা নয়, এই মাসটাতে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস বলেও একটা দিবস আছে। আমাদের মনে হয়, এই মাত্র সেদিনের ঘটনা, যেদিন মুক্ত বাংলাদেশের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খবর পেয়েছিলাম এই দেশের সব বড় বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষককে রাতের অন্ধকারে ধরে নিয়ে গেছে আলবদরের দল। তখনো সবাই ভাবছে, তাঁদের বুঝি কোথাও আটকে রাখা হয়েছে, খুঁজে পাওয়া যাবে। খুঁজে সত্যিই পাওয়া গেল, তবে হাত পা বাঁধা অবস্থায়, বধ্যভূমিতে, মৃত। হ্যাঁ, এটি সেই বদর বাহিনী, যে বদর বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মুজাহিদ।

হ্যাঁ, ডিসেম্বর মাসটা একটু অন্য রকম। সারা বছর মুক্তিযুদ্ধের সেই উত্তাল দিনগুলোর কথা মনে না করলেও যে মাসে সবাই একবার হলেও

মনে করে। এই দেশে এখনো যেসব রাজাকার ঘুরে বেড়ায়, তারা এই ডিসেম্বর মাসে গর্তে লুকিয়ে থাকে। চট করে তারা মাথা বের করে না, তারা মুখ খোলে না।

২

এই ডিসেম্বর মাসে আমরা আরও একটা কাজ করি, পেছন ফিরে তাকিয়ে সারা বছরের একটা হিসাব নিই। এই বছরের হিসাবটা শুরু হয়েছিল নাটকীয়ভাবে ১১ জানুয়ারি দিয়ে। তখন সবাই ভেবেছিল সারা বছরের হিসাবটা হবে স্বচ্ছ আর সহজ। এখন মনে হচ্ছে, হিসাবটা এত সহজ নয়, কোথাও কোথাও জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

এই বছরে যেসব বড় কাজ হয়েছে, আমার মনে হয় তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের স্কুলের ছেলেমেয়ের পাঠ্য বইগুলোতে দেশের সত্যিকারের ইতিহাস তুলে ধরা। শেষ পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ে জাতির জনক এবং বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম ঢোকানো হয়েছে। বেঁচে থাকতে জিয়াউর রহমান যে দাবি করেছিলেন, ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নামে তিনি পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেছিলেন, সেই কথাটিও এসেছে। একাত্তরের নয় মাস যে রাজাকার, আলবদর, আল-শামসরা স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে সেটা পাঠ্যবই থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল; সেই সত্যগুলো আবার পাঠ্য বইয়ে নতুন করে লেখা হয়েছে।

এই সরকারের অনেক কিছু নিয়েই আমাদের মধ্যে সংশয় রয়েছে, অনেক কিছু নিয়ে আমাদের আশাভঙ্গও হয়েছে। কিন্তু পাঠ্য বইগুলোতে সত্যিকার ইতিহাসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এই দেশটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যে আমরা আর কাউকেই সাদা চোখে বিচার করতে পারি না। মানুষটার মুখের কথা শুনে আমরা অনুমান করার চেষ্টা করি সে কী আওয়ামীপন্থী নাকি বিএনপি-জামায়াতপন্থী! বিভক্তিটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যে কেউ খোদা হাফেজ বলছে না, আল্লাহ হাফেজ বলছে, সেই কারণটাও খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। এ রকম অবস্থায় একটা রাজনৈতিক সরকার তার আমলে পাঠ্য বইয়ে একশ ভাগ সত্যি কথা লিখলেও অনেক মানুষ সেই কথাগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করত। এই সরকারের সেই সমস্যা নেই। তারা ইতিহাসের যে কথাগুলো পাঠ্য বইয়ে

লিখে যাবে, তার একটা গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। আমার ধারণা, এটি একটি অত্যন্ত কঠিন সমস্যার চমৎকার একটা সমাধান হয়ে রইল।

পাঠ্য বইগুলো আমি এখনো নিজের চোখে দেখিনি, পত্রপত্রিকা পড়ে এগুলো সম্পর্কে জেনেছি। কাজেই আরও কী কী লেখা আছে তা আমি জানি না। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়টাতে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগারে আটক করে রেখেছিল। সেই সময় তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দেশের মানুষকে স্বাধীনতার জন্য সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান যে রকম কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, ঠিক সে রকম নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বকেও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের পাঠ্য বইয়ে এই ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরা খুব প্রয়োজন।

৩

এ বছরের হিসাবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে গত আগস্ট মাসের ছাত্র বিক্ষোভ। (এটা কাকতালীয় কি না কে জানে, আগস্ট মাসেই এই দেশের অঘটনগুলো ঘটে!) ছাত্রদের এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের পর যেভাবে পুরো বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করা হলো, তা খুবই বিচিত্র। হঠাৎ করে মনে হলো, এ দেশের ছাত্র-শিক্ষকরা বুঝি সরকারের প্রতিপক্ষ। শুধু তা-ই নয়, সরকার বলতে আমরা কি ফখরুদ্দীন আহমদের সরকারকে বোঝাই, নাকি মইন উ আহমেদের সেনাবাহিনীকে বোঝাই, সেটা নিয়েই সবার মধ্যে একটা বিভ্রান্তি শুরু হয়ে গেল—সেই বিভ্রান্তি আর দূর হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক নিয়ে কী ঘটেছে, তা এখনো সবার কাছেই একটা রহস্য। আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানি, সেখানে একটা গাছের পাতাও ছেঁড়া হয়নি কিন্তু তার পরও সেখানে ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও একই অবস্থা। তাদের বেশির ভাগই পলাতক, সেই ছাত্র কিংবা তাদের বন্ধু-বান্ধবীরা মাঝেমধ্যে আমাকে ফোন করে জানতে চায়, তারা কী করবে। আমি তাদের কী বলব বুঝতে পারি না, যখন কেউ হাউমাই করে কাঁদতে থাকে, আমি তাদের কী বলে শান্তনা দেব ভেবে পাই না।

আদালতে মামলা উঠছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে কোনো অভিযোগ প্রমাণ করা যাচ্ছে না। তার পরও তাদের দুই-তিন বছর জেল হয়ে যাচ্ছে। কারও মনে কোনো দ্বিধা নেই যে পুরো ব্যাপারটা এক ধরনের

হয়রানি। বেছে বেছে কেন ছাত্র আর শিক্ষকদের হয়রানি করার জন্য বেছে নেওয়া হলো, সেটাও আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধরনের শিক্ষক থাকেন, সকল হয়রানি বেছে বেছে প্রগতিশীল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। মনে হচ্ছে, আমরা বুঝি দুই হাজার সাত সালে নই, আমরা বুঝি আছি আইয়ুব খান-মোনায়েম খানের আমলে।

শিক্ষক-ছাত্র নিগ্রহের নাটক এখনো শেষ হয়নি। রাজশাহীর শিক্ষকেরা ছাড়া পেয়েছেন, ঢাকার শিক্ষকেরা এখনো ছাড়া পাননি। মনে হচ্ছে, তাঁদের দিয়ে মুচলেকা লিখিয়ে এক ধরনের অসম্মান করানোর খুব ইচ্ছে। সেটা যদি সম্ভব না হয়, অন্তত তাঁদের একটা শাস্তি দিয়ে তারপর দয়া করে ক্ষমা করে দেওয়ার এক ধরনের নাটক করা হতে পারে। আমরা সবাই খুব কৌতূহল নিয়ে এই নাটক দেখছি, শেষ দৃশ্যে কী অভিনয় হবে, কেউ এখনো আন্দাজ করতে পারছি না।

৪

এ বছরের বড় আরেকটি ঘটনা হচ্ছে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের দেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন। এই দেশের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের সবাই এখন দেশের মাটিতে শুয়ে আছেন। যদি তাঁদের সবাইকে এক জায়গায় এনে একটা বীরশ্রেষ্ঠ কমপ্লেক্স তৈরি করা যেত, তাহলে কী চমৎকার একটা ব্যাপার হতো! সেই কমপ্লেক্সে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থাকত, বীরশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে সঙ্গে অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস থাকত, তাঁদের বীরত্বের কথা থাকত। আমাদের ছেলেমেয়েরা সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখত, বুকের ভেতর দেশের জন্য একটা গভীর মমতা অনুভব করত। ব্যাপারটা কি খুবই কঠিন?

৫

এ বছর আরেকটা বড় ঘটনা ঘটেছে; স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিটা অত্যন্ত প্রবলভাবে উঠে এসেছে। হঠাৎ করে উঠে এসেছে তা নয়, এই দাবিটা উঠেছে খুব যুক্তিসংগত কারণেই। ঠিক কী কারণ ব্যাপারটা স্পষ্ট নয়। হঠাৎ করে দেখতে পেলাম তারা অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য দিতে শুরু করেছেন। বদর বাহিনীর কমান্ডাররা বলছেন, এই দেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নেই। শুধু তা-ই নয়, উনিশ শ একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম নাকি মুক্তিযুদ্ধ নয়, একটা গৃহযুদ্ধ। সবচেয়ে আপত্তিকর বক্তব্যটি

মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে, তাঁরা দেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেননি। সুন্দরী মেয়ের লোভে, সহায়-সম্পত্তির লোভে তাঁরা অস্ত্র হাতে নেমে পড়েছেন। উনিশ শ' একাত্তর সালে পাকিস্তানের খবরের কাগজে হুবহু এভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের কথা বলা হতো—তাদের ভাষায়, মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন ভারতের চর এবং দুষ্কৃতকারী। স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনকালে হঠাৎ করে এই দেশের যুদ্ধাপরাধীরা এত বড় দুঃসাহস কেমন করে পেল?

খুব সংগত কারণেই বদর বাহিনীর কমান্ডার আর স্বাধীনতাবিরোধীদের এ ধরনের বক্তব্যে দেশের মানুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে।

দেশের সাধারণ মানুষ থেকে মুক্তিযোদ্ধারা, সবাই এক হয়ে বলছেন, যা হওয়ার হয়েছে, আর নয়। এখন এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই! বিষয়টার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। কারণ, জেনারেল মইন উ আহমেদ এবং প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন আহমদ—দুজনেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথাটা বিবেচনায় এনেছেন। দেশের মানুষ এক ধরনের আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে দেখার জন্য শেষ পর্যন্ত কী হয়।

কয়েক দিন আগে আমার কাছে একটা ই-মেইল এসেছে। যেখানে দুটি লিংক দেওয়া আছে—ইন্টারনেটে সেই লিংকে ক্লিক করা মাত্রই আমি দুটো ভিডিও ছবি দেখতে পেলাম। দুটি ভিডিওই স্বাধীনতাযুদ্ধে বিরোধিতাকারী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের অনুষ্ঠান এবং সংবাদ সম্মেলনের ভিডিও। একটাতে দেখতে পেলাম, বদর বাহিনীর কমান্ডার মতিউর রহমান নিজামী ও সে ধরনের কিছু মানুষের পাশে আমাদের আইন উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন বসে আছেন। দেখে আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। আমার খুব জানার কৌতূহল, কী কারণে তিনি সেখানে গিয়ে বসে ছিলেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি নিয়ে যখন জোর আলোচনা চলছে, তখন হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলছেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা মোটেও তাদের দায়িত্ব নয়।

সত্যি কথা বলতে কি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কিছুই করার কথা নয়। কিন্তু তারা বিচার বিভাগের পৃথককরণ সম্পন্ন করেছে (যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকের বিচারপ্রক্রিয়া দেখে সেটা এ মুহূর্তে কারও বিশ্বাস হচ্ছে না) পাঠ্যপুস্তকগুলোর সংস্কার করেছে,

দু-দুজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে জেলে আটকে রেখেছে, ডজন ডজন মন্ত্রী এবং "রাজপুত্র"দের দুর্নীতির জন্য বিচার করছে। এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করার কাজটি তাদের জন্যই সবচেয়ে সহজ। দেশের মানুষ তাদের কাছেই এটা আশা করে। তবে মতিউর রহমান নিজামীর সঙ্গে এক টেবিলে বসে থাকা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে দেখে আমি একটা বড় ধাক্কা খেয়েছি।

দ্বিতীয় ভিডিওটি দেখে আমি চমকে উঠেছি, সেখানে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসে আছেন আমাদের নির্বাচন কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব একটি এবং একটি। সেটি হচ্ছে নির্বাচন করা। সেই নির্বাচনের জন্য কি বেছে নিতে হলো এমন একজন মানুষকে, যিনি স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত?

বিজয়ের মাসে আমরা কি সে জন্য আমাদের আশাভঙ্গের বেদনাটুকু এই সরকারকে জানাতে পারি না? (যাঁরা ভিডিওগুলো দেখতে চান, তাঁরা এই লিংকগুলোতে একবার ক্লিক করে দেখতে পারেন :

http://www.youtube.com/watch?v=Zc2djYrzjoY এবং

http://youtube.com/watch?v=cjY1k8rxQcD8&feature=related)

প্রথম আলো
১৬ ডিসেম্বর ২০০৭

জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

তাঁর স্ত্রীর ড. ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

পাঠকনন্দিত এই লেখক ২০০৪ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন।